بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড- 11 / সংখ্যা-36

বাৎসরিক সাবস্ক্রিপশন ৬০০ টাকা

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

www.akhbarbadr.in

বৃহস্পতিবার 3 Sep 2026 20 রবিউল আওয়াল 1448 A.H

মহান আল্লাহ্‌র বাণী
সৃষ্টিজগতের প্রতি সহানুভূতি

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا ہَلۡ اَدُلُّکُمۡ عَلٰی تِجَارَۃٍ تُنۡجِیۡکُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِیۡمٍ ۔

تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰہِ وَرَسُوۡلِہٖ وَتُجَاہِدُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ بِاَمۡوَالِکُمۡ وَاَنۡفُسِکُمۡ ؕ

ذٰلِکُمۡ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

অনুবাদ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমি তোমাদিগকে এমনএক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে? (উহা এই যে) তোমরা আল্লাহ্‌ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

[সূরা সাফ: ১১-১২]

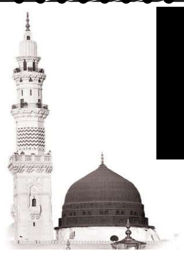

মহানবী (সা.)-এর বাণী

‘মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।’

فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ " وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ ۔

হযরত ফুযালাহ্‌ বিন উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: “প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার আমল কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে কবরের পরীক্ষার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। আমি রাসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি: ‘মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।’

[সুনান তিরমিযি, কিতাব ফাযাইলিল জিহাদ, হাদীস-১৬২১]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আত্মশুদ্ধির জন্য প্রবৃত্তিকে দমন করা আবশ্যক

হযরত আকদাস মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-বলেন:

“ঈমানের জন্য খুশূ (পরম বিনয়)-এর অবস্থা বীজের ন্যায়। এরপর অনর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে ঈমান তার কোমল সবুজ অঙ্কুর বের করে। তারপর নিজের সম্পদ যাকাত হিসেবে প্রদান করার মাধ্যমে ঈমানের বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বের হয়, যা তাকে কিছুটা শক্তিশালী করে। এরপর নফসের কামনা-বাসনার মোকাবিলা করার মাধ্যমে সেই শাখাগুলোতে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও শক্ততা সৃষ্টি হয়। তারপর নিজের অঙ্গীকার ও আমানতসমূহের সকল শাখা সংরক্ষণ করার মাধ্যমে ঈমানের বৃক্ষ তার মজবুত কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। এরপর ফল ধারণের সময় তার ওপর আরও একটি শক্তির কৃপাবারি হয়; কারণ এই শক্তি লাভের পূর্বে বৃক্ষে না ফল ধরতে পারে, না ফুল ফুটতে পারে।

(বারাহীনে আহমদিয়া, অংশ পঞ্চম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ২০৯, টীকা)

“আল্লাহ্‌ তা’আলা যখন এই জামা’ত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য এটাই রেখেছেন যে, সেই প্রকৃত মারেফত (আধ্যাত্মিক জ্ঞান), যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং সেই প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা, যা এই যুগে আর পাওয়া যেত না-পুনরায় তা প্রতিষ্ঠা করা।”

(মালফুযাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২১৩-২১৪, নতুন সংস্করণ)

তফসীরে কবীর

আত্মশুদ্ধির কাজ কোনো মানুষের সাধ্যের মধ্যে নেই

হযরত মুস্‌লেহ্‌ মওউদ (রা.)-বলেন:

“প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, আত্মশুদ্ধির কাজ কোনো মানুষের সাধ্যের মধ্যে নেই। শেষ পর্যন্ত পিতা-মাতার চেয়ে আপন সন্তানকে ভালোবাসে এমন আর কে হতে পারে? কিন্তু তারাও নিজেদের সন্তানদের আত্মশুদ্ধি করতে পারেন না। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অপরিহার্য। প্রথমত, গুনাহ্‌ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা।

গুনাহ্‌ পরিত্যাগের দিক থেকে বলা হয়েছে, আমরা তোমাদের এই শিক্ষা দিই যে, প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ্‌ তা’আলার এবং আকাশ ও পৃথিবী তথা সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু আল্লাহ্‌ তা’আলার অধীন। অতএব, যে জিনিস গ্রহণ করার জন্য তিনি অনুমতি দেন, তোমরা কেবল সেটিই গ্রহণ করো; আর যেটি থেকে তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। কারণ মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো জিনিস ব্যবহারকারী শাস্তির যোগ্য বলে গণ্য হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা। এর জন্য বলা হয়েছে, সর্বকিছু আমাদের এবং আমাদের মাধ্যমেই সব ধরনের কল্যাণ ও বরকত লাভ করা যেতে পারে। অতএব, যখন তোমরা আমাদের নির্দেশসমূহের আনুগত্য করবে, তখন আমরা তোমাদেরকে আমাদের ক্ষমার আঁচলের মধ্যে আশ্রয় দেব। আর আমাদের কুদরতপূর্ণ কর্তৃত্ব তোমাদেরকে আমাদের নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।”

[তাফসীরে কবীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৩১, প্রকাশিত: ইউ.কে.]

আহমদীয়া সংবাদ

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রিয় নেতা হযরত খলিফাতুল মসীহ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা’আলা বিনাসরিহিল আজীয আল্লাহর অনুগ্রহে সুস্থ ও কুশল আছেন।

সকল আহমদী ভাই-বোন যেন হুজুরে আনওয়ার (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা’আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর সুস্বাস্থ্য, কর্মময় দীর্ঘায়ু, মহান লক্ষ্যসমূহে সফলতা এবং বিশেষ নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত দোয়া করতে থাকেন।

আল্লাহ তা’আলা যেন প্রতিটি মুহূর্তে হুজুরের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী হন এবং তাঁকে সর্বদা নিজের সমর্থন ও বিজয় দান করেন। আমীন।

সমস্ত উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছেন, “তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খিলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন কর এবং খিলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খিলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।”

(দরসে কুরআন, পৃ. ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সম্পাদকীয়

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির ‘পয়গামে সুলহ’-এর প্রয়োজন!

স্বাধীনতার পর থেকে আমরা যতই ভবিষ্যতের কঠিন পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছি, পরিস্থিতি ও ঘটনাবলি ততই প্রকাশ করছে যে, পূর্বের তুলনায় জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন আমাদের জন্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত বিভিন্ন ধর্ম, জাতীয়তা, জাতি ও বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত এক সুন্দর ফুলের তোড়ার মতো। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যদি ঐক্য ও সংহতির ফুল সংগ্রহ করা হয়, তবে তার সুগন্ধ হৃদয় ও মনকে সুরভিত করে। কিন্তু এই বৈচিত্র্যকে যদি মতবিরোধ ও বিভেদের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, তাহলে চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। শুধু দুর্গন্ধই নয়, এমন যন্ত্রণাদায়ক দুর্গন্ধ, যা আমরা প্রতিদিন অনুভব করছি।

নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের অপব্যবহার এবং জাতি ও বর্ণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ঘৃণ্য খেলা ভারতকে এক বিপজ্জনক গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, দিন দিন এমন মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে যারা ঐক্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির কথা বলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় ও ধর্মের মধ্যেই এমন মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, যারা ঘৃণা ছড়ানোর কাজে ব্যস্ত বলে মনে হয়। অথচ এটা নিশ্চিত যে ঘৃণা, মতবিরোধ ও সংঘর্ষে শুধু একটি জাতির ক্ষতি হয় না; বরং সকল জাতিই এর শিকার হয়। বিশেষত সর্বত্র দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির মানুষই অত্যাচারের যাঁতাকলে বেশি পিষ্ট হয়। আর এই অত্যাচারের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জামাআতে আহমদিয়ার ইমাম হযরত মির্জা মসরূর আহমদ সাহেব সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দিনগুলোতে ৯ মে ২০২৫ তারিখে যে জুমার খুতবা প্রদান করেছিলেন, তাতে ভারতের আহমদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন যে, তারা যেন জামাআতে আহমদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মওউদ ও মাহদী মওউদ (আ.)-এর সেই মহান বক্তৃতা ‘পয়গামে সুলহ’-এর প্রতি স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আজ থেকে প্রায় সোয়া একশ বছর পূর্বে ভারতের অধিবাসীদের ঐক্য, সংহতি ও জাতীয় একতার দিকে আহ্বান করেছিলেন এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ দরদভরা উপদেশ প্রদান করেছিলেন। সেই উপদেশ আজও প্রত্যেক ভারতবাসীকে কর্মের আহ্বান জানাচ্ছে।

এই উপলক্ষে এর কিছু অংশ এই আশায় উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, হযরত আমীরুল মুমিনীন-এর নির্দেশ অনুসারে আমরা আহমদীরা নিজ নিজ ভাষায় এর ব্যাপক প্রচার করব। ইনশাআল্লাহ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: “হে শ্রোতৃবৃন্দ! আমরা সবাই-মুসলমান হই বা হিন্দু-শত শত মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে একমত, যিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। অনুরূপভাবে ‘মানুষ’ নামের মধ্যেও আমরা সকলেই অংশীদার; অর্থাৎ আমরা সবাই মানুষ নামে পরিচিত। তদুপরি একই দেশের অধিবাসী হওয়ার কারণে আমরা একে অপরের প্রতিবেশী। অতএব আমাদের কর্তব্য হলো, অন্তরকে পবিত্র রেখে এবং সৎ উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহযোগী হয়ে ওঠা এবং ধর্মীয় ও পার্থিব সমস্যায় একে অপরের সহানুভূতিশীল হওয়া-এমন সহানুভূতি দেখানো, যেন আমরা পরস্পরের অঙ্গ হয়ে যাই।”

“হে স্বদেশবাসীগণ! যে ধর্মে সাধারণ মানবিক সহানুভূতির শিক্ষা নেই, সে ধর্ম ধর্ম নয়। আমাদের প্রভু কোনো জাতির মধ্যে পার্থক্য করেননি। যেমন আর্যাবর্তের প্রাচীন জাতিগুলোকে তিনি যে মানবীয় শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েছেন, সেই সমস্ত শক্তি আরব, পারস্য, সিরিয়া, চীন, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিগুলোকেও দিয়েছেন। সবার জন্য আল্লাহর পৃথিবী বিছানা স্বরূপ এবং সবার জন্য তাঁর সূর্য, চন্দ্র ও অসংখ্য নক্ষত্র উজ্জ্বল প্রদীপের মতো আলো প্রদান করছে এবং অন্যান্য সেবাও করছে। তাঁর সৃষ্ট উপাদান-বায়ু, পানি, আগুন ও মাটি-এবং তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য বস্তু যেমন শস্য, ফলমূল, ঔষধ ইত্যাদি থেকে সকল জাতিই উপকৃত হচ্ছে। অতএব এই ঐশী গুণাবলি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরাও যেন আমাদের সহমানুষদের সঙ্গে সৌজন্য ও সদাচরণের মাধ্যমে আচরণ করি এবং সংকীর্ণমনা ও সংকীর্ণহৃদয় না হই।”

“বন্ধুগণ! নিশ্চিতভাবে বুঝে রাখুন, যদি আমাদের উভয় জাতির কোনো একটি জাতি আল্লাহর গুণাবলির মর্যাদা রক্ষা না করে এবং তাঁর পবিত্র গুণাবলির বিপরীতে নিজেদের আচরণ গড়ে তোলে, তাহলে সেই জাতি অতি শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শুধু নিজেকেই নয়, নিজের বংশধরদেরও ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে।”

“কোনো বিতর্ক ছাড়াই এই কথা গ্রহণ করার যোগ্য যে, সেই সত্য ও পূর্ণাঙ্গ আল্লাহ, যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক বান্দার কর্তব্য, তিনি ‘রব্বুল আলামীন’-সমস্ত জগতের প্রতিপালক। তাঁর প্রতিপালকত্ব কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কোনো বিশেষ যুগের মধ্যেও নয় এবং কোনো বিশেষ দেশের মধ্যেও নয়। বরং তিনি সকল জাতির রব, সকল যুগের রব, সকল স্থানের রব এবং সকল দেশের রব। সমস্ত অনুগ্রহের উৎসও তিনিই। প্রত্যেক দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁরই পক্ষ থেকে এবং তাঁর দ্বারাই সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালন হয়; প্রত্যেক অস্তিত্বের আশ্রয়ও তিনিই।”

“আল্লাহর অনুগ্রহ সর্বজনীন; তা সকল জাতি, সকল দেশ ও সকল যুগকে পরিবেষ্টন করে আছে। এর কারণ হলো, যাতে কোনো জাতি অভিযোগ করার সুযোগ না পায় এবং বলতে না পারে যে, আল্লাহ অমুক অমুক জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন কিন্তু আমাদের প্রতি করেননি।”

“অতএব যখন আমাদের প্রভুর গুণাবলি এমন, তখন আমাদের পক্ষেও তাঁর গুণাবলির অনুসরণ করাই উপযুক্ত। সুতরাং হে আমার স্বদেশবাসী ভাইয়েরা! ‘পয়গামে সুলহ’ নামের এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাদের সকলের কাছে পেশ করা হচ্ছে এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই আপনাদের অন্তরে এই বিষয়টি প্রেরণ করুন এবং আমাদের সহানুভূতির রহস্য আপনাদের হৃদয়ের ওপর উন্মোচিত করে দিন, যাতে আপনারা এই বন্ধুত্বপূর্ণ উপহারকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে না করেন।”

“বন্ধুগণ! পরকালের বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে অধিকাংশ সময়ই গোপন থাকে এবং যারা মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাদের ওপরই পরকালের রহস্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুনিয়ার মন্দ ও ভালো প্রত্যেক দূরদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিনতে পারে।”

“এ কথা কারও কাছে গোপন নয় যে, ঐক্য এমন একটি বিষয় যার দ্বারা এমন বিপদও দূর হয়ে যায়, যা কোনোভাবেই দূর করা সম্ভব নয়; এমন সমস্যাও ঐক্যের মাধ্যমে সমাধান হয়ে যায়, যা কোনো কৌশলেই সমাধান করা যায় না। অতএব কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য এটা অসমীচীন যে, সে ঐক্যের বরকত থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে।”

“হিন্দু ও মুসলমান এই দেশে এমন দুটি জাতি যে, এটা একটি অসম্ভব কল্পনা যে, কোনো সময় হিন্দুরা একত্র হয়ে মুসলমানদের এই দেশ থেকে বের করে দেবে, অথবা মুসলমানরা একত্র হয়ে হিন্দুদের দেশছাড়া করবে। বরং এখন তো হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, একজনের সঙ্গে অন্যজনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হয়ে গেছে। একজনের ওপর কোনো বিপর্যয় এলে অন্যজনও তাতে অংশীদার হবে। আর যদি কোনো একটি জাতি কেবল নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে অন্য জাতিকে হেয় করতে চায়, তাহলে সেও অবমাননার কলঙ্ক থেকে রেহাই পাবে না। আর যদি তাদের কোনো একজন তার প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার ক্ষতিও তাকেই বহন করতে হবে।”

“তোমাদের উভয় জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি অন্য জাতির ধ্বংসের চিন্তায় ব্যস্ত, তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে একটি ডালের ওপর বসে সেই ডালটিই কাটছে।”

“আপনারা আল্লাহর অনুগ্রহে শিক্ষিতও হয়ে উঠেছেন। এখন বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে ভালোবাসায় উন্নতি করা আপনাদের জন্য শোভনীয় এবং নির্দয়তা পরিত্যাগ করে সহানুভূতি গ্রহণ করা আপনাদের বুদ্ধিমত্তার উপযোগী।”

“দুনিয়ার সমস্যাগুলোও যেন এক মরুভূমির সফর, যা প্রচণ্ড গরম ও সূর্যের তাপের সময় সম্পন্ন করতে হয়। অতএব এই কঠিন পথের জন্য পারস্পরিক ঐক্যের সেই শীতল পানির প্রয়োজন, যা এই জ্বলন্ত আগুনকে ঠান্ডা করে দেবে এবং তৃষ্ণার সময় মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা করবে।”

“এমন এক সংকটময় সময়ে এই লেখক আপনাদের শান্তির দিকে আহ্বান করছেন, যখন উভয় পক্ষেরই শান্তির অত্যন্ত প্রয়োজন।”

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মহান বক্তৃতার এই দূরদর্শী ও আলোকপ্রদ অংশগুলো আজকের ভারতেও ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে এর ওপর আমল করার এবং এর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family Bithari, 24 PGS (N)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Noor Jahan Begum, (Kolkata)

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞতাবোধ

"এ কথা সর্বপ্রকারে প্রমাণিত যে, মির্জা সাহেব তাঁর স্বভাব-অভ্যাসে সরল এবং উদার অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর নৈতিক সাহস-যা তিনি তাঁর বিরোধীদের পক্ষ থেকে কঠোর বিরোধিতা ও নির্যাতনের মোকাবিলায় প্রদর্শন করেছেন-নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কেবল এমন একজন ব্যক্তিই, যার মধ্যে চুম্বকের মতো আকর্ষণ এবং অত্যন্ত মনোরম চরিত্র ছিল, এমন লোকদের বন্ধুত্ব ও আনুগত্য লাভ করতে পারতেন, যাদের মধ্যে অন্তত দুজন আফগানিস্তানে নিজেদের বিশ্বাসের কারণে প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু মির্জা সাহেবের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। আমি কিছু প্রবীণ আহমদীর কাছে তাঁদের আহমদী হওয়ার কারণ জানতে চেয়েছিলাম। অধিকাংশই সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে মির্জা সাহেবের ব্যক্তিগত প্রভাব এবং তাঁর আকর্ষণশক্তি ও হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্বকে উল্লেখ করেছেন।"

(পাদ্রী ওয়াল্টার এম.এ., The Ahmadiya Movement গ্রন্থের লেখক)

আপনি আলাইহিস সালামের জীবনে দানশীলতা ও দয়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে সুপারিশ ও মধ্যস্থতার রূপ দেখা যায়। কখনো কখনো আপনার খেদমতে এমন কোনো প্রার্থী আসতেন, যার আবেদন পূরণ করা আপনার নিজের ক্ষমতার মধ্যে থাকত না; বরং তার বিষয়টি অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এমন অবস্থায়ও আপনি তার উপকারের জন্য এমন ব্যক্তিদের কাছেও সুপারিশ করতেন, যাদের কাছে নিজের কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও কখনো কিছু চাইতেন না। এটি এমন এক মহান, উদার ও আন্তরিক বৈশিষ্ট্য, যা পৃথিবীতে অত্যন্ত অল্পই দেখা যায়। এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয় যে, মির্জা ইমামুদ্দীন সাহেবের শত্রুতা ও বিদ্বেষ কোনো গোপন বিষয় ছিল না। কিন্তু যখনই নেকি ও অনুগ্রহ করার সুযোগ এসেছে, তখন সেই শত্রুতার কথা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের কখনো মনেই আসেনি এবং তাঁকে উপকার করার ব্যাপারে কখনো দ্বিধা করেননি।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১০ জুলাই , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১০ ওয়াফা, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন যে, তাঁর (আ.) জীবনে দানশীলতা ও অনুগ্রহের আরেকটি বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেত, যা সুপারিশ ও মধ্যস্থতার রূপ ধারণ করত। কখনো কখনো এমন কোনো প্রার্থী তাঁর সেবায় উপস্থিত হতো, যার আবেদন পূরণ করা তাঁর নিজের ক্ষমতার মধ্যে ছিল না; বরং তার সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক থাকত। এমন অবস্থায়ও তিনি এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ যত্ন রাখতেন যে, তার উপকারের জন্য এমন লোকদের কাছেও সুপারিশ করে দেবেন, যাদের কাছে তিনি নিজের কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য কখনো কিছু চাইতেন না।

অর্থাৎ, অন্য লোকদের কাজ করিয়ে নিতেন, কিন্তু নিজের কাজ কখনো সেই ব্যক্তির দ্বারা করাতেন না। তিনি লেখেন যে, এটি এমন এক মহানুভব ও আন্তরিক বৈশিষ্ট্য, যা পৃথিবীতে খুবই কম দেখা যায়।

অতঃপর তিনি মির্জা ইমামুদ্দীন সাহেবের উল্লেখ করে লেখেন যে, এটি কোনো গোপন বিষয় নয় যে মির্জা ইমামুদ্দীন সাহেব এই জামাআতের কঠোর বিরোধী ছিলেন এবং হযরত (আ.)-এর পরিবারের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এই শত্রুতাকে পার্থিব বিষয়াদিতে সর্বদা উপেক্ষা করতেন। দ্বীনের ব্যাপারে বিষয়টি ভিন্ন ছিল। হযরত (আ.) দ্বীনের ব্যাপারে শত্রুতা সহ্য করতেন না; কিন্তু পার্থিব বিষয়াদিতে তিনি কখনো তা পরোয়া করেননি। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সদাচরণে কখনো কোনো পার্থক্য করেননি। তিনি অনেক সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যও নিতেন এবং এতসব অনুগ্রহ লাভ করা সত্ত্বেও বিরোধিতায়ও লিপ্ত থাকতেন এবং এভাবে তিনি তিক্ত শত্রু ছিলেন।

একবার তিনি একটি ঘোড়া বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি উত্তম ব্যবস্থা মনে করলেন যে, ঘোড়াটিকে জম্মু নিয়ে যাওয়া হবে এবং হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলভী নূরুদ্দীন সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ প্রথম (রা.)-এর মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হবে, যাতে এর জন্য একটি উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়। সেখানে রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল; তারা এটি কিনে নিতে পারেন। এই প্রস্তাবের কথা বিবেচনা করে মির্জা ইমামুদ্দীন নিজেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আবেদন করলেন যে, তিনি যেন হযরত হাকীমুল উম্মতের নামে একটি সুপারিশপত্র লিখে দেন। হযরত (আ.) তাঁর এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেননি এবং কোনো দ্বিধা ছাড়াই হযরত মাওলভী সাহেব (রা.)-এর নামে একটি সুপারিশপত্র দিয়ে দিলেন। তিনি লেখেন যে,

এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয় যে, মির্জা ইমামুদ্দীন সাহেবের শত্রুতা ও বিরোধিতা কোনো গোপন বিষয় ছিল না; কিন্তু যখনই নেকি ও অনুগ্রহ করার বিষয় এসেছে, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মনে কখনো এই শত্রুতার কথা আসেনি। তাঁকে উপকার পৌঁছাতে তিনি কখনো দ্বিধা করেননি।

(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) ইরফানীর রচিত 'সীরত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৬-২৯৭ থেকে গৃহীত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মাওলভী নূরুদ্দীন (রা.)-কে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা ছিল:

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম-এর পর লিখেছেন:

"মুখদুমী মুকাররমী আখোয়ীম মাওলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব সাল্লামাহু তাআলা।আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হলো আপনাকে একটি কষ্ট দেওয়া। আশা করি, আপনি মনোযোগ ও প্রচেষ্টার কোনো ত্রুটি করবেন না।" অর্থাৎ তিনি বিশেষ মনোযোগের প্রতি জোর দিয়েছেন। "আর তা হলো, মির্জা ইমামুদ্দীন সাহেব, যিনি আমার একজন চাচাতো ভাই, তাঁর কাছে একটি অত্যন্ত মূল্যবান ঘোড়া রয়েছে, যা দ্রুতগামী এবং রাজা ও রইসদের সওয়ারির উপযোগী। এখন তিনি এটি বিক্রি করতে চান। যেহেতু সাধারণ মানুষ এ ধরনের মূল্যবান ঘোড়া কিনতে পারে না এবং রইসরা নিজেরাই এ ধরনের জিনিসের সন্ধানে থাকেন, তাই আমি অনুরোধ করছি যে, আপনি অনুগ্রহ করে জম্মুর রইস অথবা তাঁর কোনো ভাইয়ের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করে চেষ্টা করুন, যাতে তাঁরা উপযুক্ত মূল্যে ঘোড়াটি কিনে নেন। তাঁদের পক্ষ থেকে কেনার ইচ্ছা দৃঢ় হলে ঘোড়াটি আপনার কাছে পাঠানো হবে। অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করার পর আমাকে অবহিত করবেন।"

"ওয়াসসালাম। খাকসার, মির্জা গোলাম আহমদ।"

(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) ইরফানীর রচিত 'সীরত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮)

এটি ১৮৮৮ সালের ঘটনা। সে সময় মির্জা ইমামুদ্দীনের পক্ষ থেকে শত্রুতা ছিল, কিন্তু তখনও হযরত (আ.)-এর দাবির প্রকাশ ঘটেনি। অতএব, সেই অবস্থাতেও তিনি তাঁর এই শত্রু ভাইকে সাহায্য করেছিলেন।

হযরত শেখ মুহাম্মদ নসীব সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন:

আমি কোনো এক সময় সেই শিখ ছুতারদের বাড়িতে ভাড়ায় থাকতাম, যা মির্জা নিজামুদ্দীন সাহেব সরদার নম্বরদারের বাড়ির একেবারে কাছেই ছিল। কোনো একটি বিষয় নিয়ে বাড়ির মালিক মহিলা আমার সঙ্গে অযথা ঝগড়া করলেন এবং আমাকে বাড়ি খালি করতে বললেন। আমি বললাম, যখন স্ট্যাম্পে লিখিত চুক্তি রয়েছে, চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং আমি নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করছি, তখন আমি বাড়ি খালি করব না।

তিনি এ ব্যাপারে মির্জা নিজামুদ্দীন সাহেবের সাহায্য নিতে চাইলেন এবং তিনি বারবার খায়রুদ্দীন সাহেব নামের একজন চৌকিদারের মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কখনো আমি যেতাম এবং কখনো যেতাম না। যাইহোক, তিনি আমাকে ভয় দেখিয়ে বলতেন যে গোলযোগ হয়ে যাবে এবং বাড়ি খালি করাতে চাইতেন; কিন্তু আমি খালি করতাম না।

এরপর মির্জা সাহেব শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.)-এর কাছে সাহায্য চাইলেন। মির্জা নিজামুদ্দীন সাহেব যখন শেখ সাহেব (রা.)-কে বললেন,

তখন শেখ সাহেব (রা.) আমাকে বললেন, ভালো হয় তুমি বাড়ি খালি করে দাও। সে সময় আমার ঘরে একটি কন্যাসন্তান জন্মেছিল। বাড়ি পরিবর্তন করা আমার জন্য কঠিন ছিল। আমি বিষয়টি হযরত মাওলভী নুরুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। মাওলভী সাহেব (রা.) শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং লিখলেন, "তুমি আগে তার জন্য কোনো বাড়ির ব্যবস্থা করে দাও, তারপর তাকে বাড়ি খালি করতে বলো।"

শেখ সাহেব (রা.) মাওলভী সাহেব (রা.)-এর অসন্তুষ্টির কারণে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলেন এবং মির্জা নিজামুদ্দীন সাহেব তাঁর দাবি অব্যাহত রাখলেন।

তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত একদিন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খেদমতে পুরো ঘটনা লিখে জানালাম। হযরত (আ.) অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং বললেন, "এটি পড়ে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। আমার কাছে যদি কোনো খালি বাড়ি থাকত, তাহলে অবশ্যই দিয়ে দিতাম। ভবিষ্যতে আমি এ বিষয়ে খেয়াল রাখব।"

এরপর হযরত (আ.) আরও বললেন, "আজ যোহরের নামাজের জন্য যখন আসবে এবং শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.)-ও যদি আসেন, তাহলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। সে সময় মসজিদে মুবারকের সম্প্রসারণের কাজ চলছিল এবং যে বাড়িতে নামাজ পড়া হতো, সেটি ছিল হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর বাড়ি।

তিনি বলেন, যখন আমি যোহরের নামাজের জন্য গেলাম, তখন হুযূর (আ.) উপস্থিত হলেন। আমি তখনও কিছু বলিনি। আমাকে দেখে হযরত (আ.) নিজেই বললেন, "মির্জা নিজামুদ্দীনের পক্ষ থেকে একজন মহিলা এসেছিল। আমি তাদের কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন তোমার আর কোনো কষ্ট হবে না।"

এরপর সত্যিই কেউ আমাকে আর কিছু বলেনি এবং আমি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেই বাড়িতে ছিলাম, যতক্ষণ না সদর আনজুমান আহমদিয়ার পক্ষ থেকে আমাকে একটি কোয়ার্টার বরাদ্দ করা হয়। যখন আনজুমানের পক্ষ থেকে বাড়ি পাওয়ার পর আমি সেই বাড়ি খালি করলাম, তখন আবার সেই মহিলার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলেন, তার কারণে সে এখন আমাকে যেতে দিতে চাইছিল না এবং অঝোরে কাঁদছিল যে, "আপনি কেন চলে যাচ্ছেন?

হয়তো এর আগে ঝগড়ার অবস্থার কারণে অথবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আচরণের কারণে এবং তাঁর পক্ষ থেকে যে অনুগ্রহ সে পেয়েছিল, তার কারণে তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।

তিনি লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর একজন সামান্য খাদেমের প্রতি যে সহানুভূতি ও অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অথচ মির্জা নিজামুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তাঁর কোনো ধরনের কথাবার্তাও ছিল না, তাঁর সঙ্গে কোনো আসা-যাওয়াও ছিল না। সবাই জানত যে তাঁদের সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত (আ.) আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করেছিলেন।

(রেওয়ায়াতে আসহাবে আহমদ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৫-৪৪৬, হযরত শেখ মুহাম্মদ নসীব সাহেব (রা.)-এর বর্ণনা থেকে গৃহীত)

হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব (রা.) বলেন, "মির্জা মুহাম্মদ বেগ, মির্জা আহমদ বেগ সাহেব হোশিয়ারপুরীর পুত্রের ঘটনাটিও লিপিবদ্ধ করে দিচ্ছি। মির্জা মুহাম্মদ বেগের পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো ছিল না এবং এই সম্পর্কের তিক্ততা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্যই ছিল।" এটি আহমদ বেগ ও মুহাম্মদী বেগমের পরিবার ছিল, যারা অত্যন্ত ধর্মবিমুখ ছিল এবং জামাতের বিরোধিতা করত। "মির্জা মুহাম্মদ বেগ জম্মু গিয়ে চাকরি করতে চেয়েছিলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে সুপারিশ চেয়েছিলেন, যাতে হযরত হাকীমুল উম্মতের নামে একটি সুপারিশপত্র দেওয়া হয়। হযরত (আ.) কোনো দ্বিধা না করে নিম্নলিখিত পত্রটি লিখে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি কোনো বৈধ আবেদন প্রত্যাখ্যান করতেন না।" এতে লেখা ছিল, "মুহাম্মদ বেগ নামের যে ছেলেটি আপনার কাছে আছে, তার পিতা মির্জা আহমদ বেগ তাঁর অজ্ঞতা ও সংকোচের কারণে এই বিনীত ব্যক্তির প্রতি কঠোর শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করেন... এতে কোনো অসুবিধা নেই যে, এই লোকদের কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা অবলম্বন করে *'ইদফা বিল্লাতি হিয়া আহসান'*.-অর্থাৎ যে পদ্ধতি সর্বোত্তম, তার মাধ্যমে প্রতিহত করো-"এর সওয়াব অর্জন করা যায়।" অর্থাৎ উত্তম পদ্ধতিতে তার জবাব দেব, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। তাহলে আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ অনুসরণ করে এর সওয়াব কেন অর্জন করব না? "এই ছেলে মুহাম্মদ বেগের এমন বিষয়বস্তু সম্বলিত কয়েকটি চিঠি পৌঁছেছে যে, মৌলভী সাহেব যেন আমাকে পুলিশ বিভাগে চাকরি দিয়ে দেন।" এই চিঠির পর হযরত মৌলভী সাহেব তাকে পুলিশ বিভাগে চাকরি দিয়ে দেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

এই ঘটনাগুলো থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত (আ.) সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উপকার সাধনের জন্য প্রস্তুত থাকতেন এবং দান-খয়রাত ও সুপারিশ করতে কখনো বিরত থাকতেন না। এসবের পাশাপাশি যেখানে হযরত (আ.) দেখতেন যে কোনো কিছু দেওয়া অপচয়ের পর্যায়ে পড়ছে, সেখানে তিনি তা থেকে বিরত থাকতেন। অপচয় করা উচিত নয়।

(সীরত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী, হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) ইরফানী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮-২৯৯)

হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) আরও লেখেন, "কাদিয়ানে নেহাল চাঁদ (নেহালা) নামে এক ব্যক্তি-তাকে "বাহারু রাজ" বলা হতো- "একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। একজন ব্যক্তি নেহাল চাঁদ 'বাহারু রাজ' একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, হিন্দু ছিলেন। যৌবনকালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ মামলাবাজ ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রায় একই অবস্থা ছিল। তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা সাধারণত হযরত আকদাস (আ.)-এর পরিবারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দুষ্টুমি করত। আবার জামাতের বিরোধীদের সঙ্গেও তিনি থাকতেন। জীবনের শেষদিকে তাঁর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে এবং এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, কখনো কখনো তাঁর দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো।" অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছিল। "একবার তিনি হযরত আকদাস (আ.)-এর দরজায় এসে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন এবং খবর পাঠালেন।" তিনি শত্রু ছিলেন, কিন্তু এ ধরনের লোকেরা শেষ পর্যন্ত লজ্জা না রেখেই তাঁর দরবারে হাজির হয়ে গেলেন। সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষার কথা জানানো হলো। "হযরত সাহেব (আ.) সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলেন। তিনি সালাম করে নিজের ঘটনা বলতে শুরু করলেন। হযরত আকদাস (আ.) শুধু তাঁকে সান্ত্বনাই দিলেন না, বরং পঁচিশ টাকা এনে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'এই মুহূর্তে এটি দিয়ে কাজ চালাও। এরপর যখন প্রয়োজন হবে, আমাকে জানিও।' এরপর থেকে ওই ব্যক্তির নিয়ম হয়ে গেল যে, সে এক-দুই মাস পরপর আসত এবং নিজের প্রয়োজনের জন্য হযরত (আ.)-এর কাছ থেকে একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ নিয়ে যেত। সে শুধু হযরত আকদাস (আ.)-এর কাছ থেকেই নিত না, বরং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছ থেকেও ঋণ হিসেবে একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে নিয়েছিল।

যখন প্রতিশ্রুত সময় পার হয়ে গেল, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তাঁর কাছে টাকা দাবি করালেন। কিন্তু সে এভাবে উপর-উপর একটি উত্তর দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে গেল। অবশেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমাকে-বর্ণনাকারী বলেন-"বললেন, আমি যেন তার কাছে টাকা দাবি করি। আমি যখন তাকে বললাম, তখন সে উপরোক্ত ঘটনা-যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে-"নিজের ভাষায় বর্ণনা করে বলল, 'মৌলভী সাহেব বারবার লোক পাঠান, কিন্তু মির্জা সাহেব (আ.) তো আমাকে সবসময় টাকা দেন এবং তা দিয়েই আমার সংসার চলে।'"আমি এসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, "আচ্ছা, এখন তাকে আর কিছু বলো না।" হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এরপর আর তাঁর কাছে টাকা দাবি করেননি।

"অনুরূপভাবে পণ্ডিত বৈজনাথ নামের একজন ব্যক্তিও ছিলেনচ-তিনি বলেন-"আমি জানি যে, কোনো কোনো সময় হযরত (আ.) তাঁর সঙ্গেও সদাচরণ করেছিলেন, যদিও তাঁর আচরণ ভালো ছিল না।

(সীরত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী, হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) আরিফানী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৯-২৯০)

হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ 'আহমদিয়া মুভমেন্ট'-এ লেখেন যে, পাদ্রী ওয়াল্টার (Walter), এম.এ., যিনি ওয়াই.এম.সি.এ. (YMCA)-এর সেক্রেটারি ছিলেন এবং পাদ্রী ছিলেন, তিনি 'আহমদিয়া মুভমেন্ট' নামে একটি বই লিখেছিলেন। এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন:

"সব দিক থেকেই এটা প্রমাণিত যে, মির্জা সাহেব তাঁর অভ্যাসে সরল এবং উদার অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর নৈতিক সাহস, যা তিনি তাঁর বিরোধীদের কঠোর বিরোধিতা ও নির্যাতনের মোকাবিলায় প্রদর্শন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কেবল এমন একজন ব্যক্তি, যার মধ্যে আকর্ষণ করার এক চৌম্বকীয় শক্তি এবং অত্যন্ত মনোরম চরিত্র রয়েছে, তিনিই এমন লোকদের বন্ধুত্ব ও আনুগত্য অর্জন করতে পারেন, যাদের মধ্যে অন্তত দুজন আফগানিস্তানে নিজেদের বিশ্বাসের কারণে প্রাণ দিয়েছিলেন।"

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

এখানে আফগানিস্তানের শহীদদের উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিও তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আচরণের কারণেই হয়েছিল।

“কিন্তু মির্জা সাহেবের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। আমি কয়েকজন পুরাতন আহমদীর কাছে তাঁদের আহমদী হওয়ার কারণ জানতে চাইলে, অধিকাংশই প্রধান কারণ হিসেবে মির্জা সাহেবের ব্যক্তিগত প্রভাব এবং তাঁর আকর্ষণ ও হৃদয়কে নিজের দিকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন।”

(সীরতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃষ্ঠা ২৬৮-২৬৯, বর্ণনা ২৯৭)

সাধারণ সভাগুলোতেও হযরত (আ.) প্রায়ই বলতেন যে, বিরোধীরাও যদি আসে এবং তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য তাঁর কাছে প্রশ্ন করে, তাহলে তিনি তাদের খরচ বহন করতেও প্রস্তুত। এ সম্পর্কে হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (আ.) লেখেন যে, মিয়াঁ ফখরুদ্দীন সাহেব মুলতানী আমাকে বলেছেন, “হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সময়ে একবার আমার পিতা এখানে এসেছিলেন। তিনি কঠোর বিরোধী ও কটুস্বভাবের ছিলেন। এখানে এসেও তিনি অত্যন্ত তীব্র কথাবার্তা বলতে থাকলেন এবং যখন তিনি মুলতানে ছিলেন তখন বলতেন, ‘আমি যদি কখনো মির্জার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তাহলে-নাউযুবিল্লাহ-তাঁর মুখের সামনেও অভিশাপ দেব।’ অর্থাৎ সামনে গিয়েও এখানে যা বলি, তাই বলব। যাই হোক, আমি তাঁকে হযরত সাহেব (আ.)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। হুজুর (আ.) যখন বাইরে এলেন, তখন তিনিচ-বলেন, আমার পিতা সেই সময় অত্যন্ত-“সম্মানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পরে ভীত হয়ে পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়লেন। সেই সময় সভায় আরও লোকজন ছিলেন। হুজুর (আ.) বসেইচ-কোনো প্রশ্ন না করেই-“বক্তৃতা শুরু করলেন এবং কয়েকবার বললেন, ‘আমরা তো চাই যে, লোকেরা আমাদের কাছে আসুক, আমাদের কথা শুনুক এবং আমাদের কাছে প্রশ্ন করুক। আমরা তাদের জন্য খরচ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু প্রথমত লোকেরা আসে না, আর যদি আসে, তাহলে নীরবে বসে থাকে এবং পরে বাইরে গিয়ে কথা বলে।’ মোটকথা, হুজুর (আ.) খোলাখুলিভাবে বক্তৃতা ও তবলীগ করলেন এবং তাঁকে কথা বলার জন্য কয়েকবার উৎসাহিত করলেন। আমার পিতা অত্যন্ত বাকপটু ছিলেন, কিন্তু তাঁর সামনে যেন তাঁর মুখে সিলমোহর লেগে গেল এবং তিনি একটি কথাও বলতে পারলেন না। সেখান থেকে উঠে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি সেখানে কথা বললেন না কেন?’ ”কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না, কথার মধ্যে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। যাই হোক, “মিয়াঁ ফখরুদ্দীন সাহেব বলতেন যে, হযরত সাহেব (আ.) তাঁর বক্তৃতায় আমার পিতাকে সম্বোধন করেননি, বরং সাধারণভাবে বক্তৃতা করেছিলেন।” কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মিয়াঁ ফখরুদ্দীন সাহেবও খিলাফতে সানিয়ার যুগে জামাত ত্যাগ করেছিলেন। (সীরতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫, বর্ণনা ৭৪)

হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, মৌলভী আবদুল কাদির সাহেব মরহুম লুধিয়ানভীর কন্যা সাফিয়া বেগম, যিনি নুসরাত হাই স্কুলে শিক্ষিকা, আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, “একবার একজন ভিক্ষুক জানালার মাধ্যমে একটি কুর্তা চাইছিলেন।” একজন ভিক্ষুক এসেছিল। সে একটি কুর্তা চেয়েছিল। “হযরত সাহেব (আ.) নিজের কুর্তা খুলে জানালা দিয়ে সেই ফকিরকে দিয়ে দিলেন। আমার মরহুম পিতা বললেন-তিনি তা দেখছিলেন-“আল্লাহ্ আল্লাহ্! কী অপূর্ব দানশীলতা প্রদর্শন করছেন।”

(সীরতুল মাহদী, খণ্ড ২, অংশ ৫, পৃষ্ঠা ৩১১, বর্ণনা ১৫৬৫)

হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুল বিবি সাহেবা, মরহুম হাফেজ হামিদ আলী সাহেবের স্ত্রী, যিনি মৌলভী আবদুর রহমান সাহেব ফাযিল জাটের শাশুড়ি ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, “আমাদের সমস্ত রুটি-কাপড়ের খরচ হুজুর (আ.)-ই দিতেন। একবার হুজুর (আ.) নিজের জন্য এবং হাফেজ হামিদ আলী সাহেবের জন্য একটি কাপড়ের ভেস্ট বানিয়েছিলেন। একই ধরনের ভেস্ট। তখন শীতকাল ছিল। আমি হাফেজ সাহেবকে বললাম, আমি যখন সকালে তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য উঠি এবং সেহ্‌রি রান্না করি, তখন আমার শীত লাগে। হাফেজ সাহেব হুজুর (আ.) যে গরম ভেস্টটি তাঁর জন্য বানিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি আমাকে দিয়ে বললেন, ‘তুমি এটি পরে নিয়ো।’ আমি যখন এটি পরে গিয়ে অঙ্গীঠি ও চুলায় আগুন জ্বালাচ্ছিলাম, তখন হুজুর (আ.) এসে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘রসুল বিবি! তুমি কি আমার ভেস্টটি চুরি করে নিয়েছ?’”তিনি মজা করে বলেছিলেন। “আমি আরজ করলাম, ‘হুজুর! সব কিছুই তো আপনার। আপনারই খাই, আপনারই পরি।’ এতে হুজুর (আ.) হাসলেন। আপনি (আ.) বললেন, ‘ভালো করে খাও এবং পান করো।’

(সীরতুল মাহদী, খণ্ড ২, অংশ ৫, পৃষ্ঠা ২৮৮, বর্ণনা ১৫১৭ থেকে গৃহীত)

হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী সাহেব? বর্ণনা করেন যে,

“আপনার (আ.) সাধারণ অভ্যাস ছিল, কাউকে যা কিছু দিতেন তা কোনো প্রদর্শনের জন্য হতো না; বরং কেবল আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধের দৃষ্টিকোণ থেকে। এ কারণে সাধারণত আপনি (আ.) অত্যন্ত গোপন পদ্ধতিতে এসব দান করতেন এবং কখনো কখনো অন্যদের উৎসাহিত করার জন্য এবং বাস্তব শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবেও করতেন।

গোপনে দান করার ক্ষেত্রে আপনার (আ.) এটিও একটি পদ্ধতি ছিল যে, কখনো কখনো এমনভাবে দিতেন যে, যিনি গ্রহণ করতেন তিনিও কষ্টে জানতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে-তিনি বলেন-“আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। মুনশী মুহাম্মদ নসীব সাহেব (যিনি বর্তমানে কাদিয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন) একজন এতিমের অবস্থায় কাদিয়ানে এসেছিলেন এবং হযরত আকদস (আ.)-এর দয়া ও অনুগ্রহে কাদিয়ানে থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর যাবতীয় ব্যয় ও প্রয়োজনের দায়ভার জামাতের ওপর ছিল। যখন তিনি যুবক হলেন এবং তাঁর বিয়ে হয়ে গেল, তখন তিনি লাহোরে একটি সংবাদপত্রের অফিসে মুহরির হিসেবে কাজ করতেন এবং পরে কাদিয়ানের বদর অফিসে এসে মাসিক বারো টাকা বেতনে চাকরি করেন। আল্লাহ্ তা’লা যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে তাঁর প্রথম পুত্র নসীর আহমদ-যিনি পরে ইন্তেকাল করেন-“দান করলেন, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মরহুম নসীর আহমদ সাহেবের জন্য একজন আন্নার-অর্থাৎ শিশুকে দেখাশোনা ও লালন-পালনকারী নারী-“প্রয়োজন হলো। তিনি বলেন, ‘আমি শায়খ মুহাম্মদ নসীব সাহেবকে উৎসাহিত করলাম যে, এমন সময়ে তুমি তোমার স্ত্রীর সেবা গ্রহণের জন্য পেশ করো। এটি একই সঙ্গে আনন্দ ও সওয়াবের সুযোগ।’ অর্থাৎ এমন কাজ যাতে আনন্দও আছে এবং সওয়াবও আছে। তোমার দ্বিগুণ লাভ হবে।

আমার পরামর্শকে শায়খ সাহেব অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখলেন এবং তিনি এই সুযোগ পেলেন। তাঁর স্ত্রী শাহজাদা নসীর আহমদ সাহেবকে দুধ পান করানোর কাজে নিযুক্ত হলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কথায় কথায় জানতে চাইলেন যে, শায়খ মুহাম্মদ নসীব সাহেব কত বেতন পান। যখন আপনি (আ.) জানতে পারলেন যে, তিনি মাত্র বারো টাকা পান, তখন আপনি (আ.) অনুভব করলেন যে, এত অল্প বেতনে হয়তো তাঁর সংসার চলে না। যদিও তখন-সময়টি অত্যন্ত সস্তার ছিল-“সস্তার যুগ ছিল, কিন্তু হযরত আকদস (আ.)-এর মনে এই অনুভূতি হলো। একদিন যাওয়ার সময় তাঁর ঘরে বিশ-পঁচিশ টাকার একটি পুঁটলি ছুড়ে দিয়ে গেলেন। শায়খ সাহেব ভাবলেন, জানি না এই টাকা কীভাবে এসেছে। অবশেষে জানা গেল যে, হযরত আকদস (আ.) তাঁর আর্থিক সংকট অনুভব করে তা রেখে দিয়েছেন, যাতে তাঁর কষ্ট না হয় এবং তিনি স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারেন। অতঃপর তিনি সেই টাকা গহনা তৈরিতে ব্যয় করেন, কারণ তখন তাঁর খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন হযরত (আ.)-এর বিস্তৃত দস্তরখান থেকেই পূরণ হয়ে যেত।” (সীরত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) আরিফানী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৫ থেকে গৃহীত)

হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) আরও বলেন, “যেখানে আপনার (আ.) অভ্যাস ছিল যে, আপনি কোনো প্রার্থনাকারীকে কখনো ফিরিয়ে দিতেন না, সেখানে এটিও আপনার (আ.)-এর দৈনন্দিন অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, কিছু মানুষের প্রয়োজন অনুভব করে অযাচিতভাবে তাদের সাহায্য করতেন। যেমন, ২৮ অক্টোবর ১৯০৪ সালের কথা। ফজরের আগে আপনি আট বা দশ টাকা-সংখ্যাটি এতটাই হবে-একজন নিষ্ঠাবান মুহাজিরকে এই বলে দিয়েছিলেন যে, ‘শীতকাল। আপনার কাপড়ের প্রয়োজন হবে।’

সেই মুহাজিরের পক্ষ থেকে কোনো আবেদন ছিল না। হযরত (আ.) নিজেই তাঁর প্রয়োজন অনুভব করে এই অর্থ প্রদান করেছিলেন।

এই ঘটনা শুধু একটি ঘটনা নয়; বহুবার এমন হতো এবং আপনি (আ.) সাধারণত গোপনে অভাবগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করতেন। এক্ষেত্রে কোনো বন্ধু-শত্রু, হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না।

(সীরত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী সাহেব? আরিফানী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮-২৮৯ থেকে গৃহীত)

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রাঃ) লেখেন, “হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অভ্যাসের মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, কখনো কখনো তিনি কারও প্রয়োজন ও অভাব অনুভব করে তার চাওয়া বা প্রকাশ করার অপেক্ষা করতেন না; বরং নিজে থেকেই তা দিয়ে দিতেন।”

এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শেখ ফতেহ মুহাম্মদ সাহেব, কাশ্মীর রাজ্যের পেনশনপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর, যিনি দীর্ঘকাল ধরে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খেদমতে আসতেন, বর্ণনা করেন, “আমি যখনই হযরত (আঃ)-এর খেদমতে আসতাম, তিনি সবসময় আমার ভাড়া পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

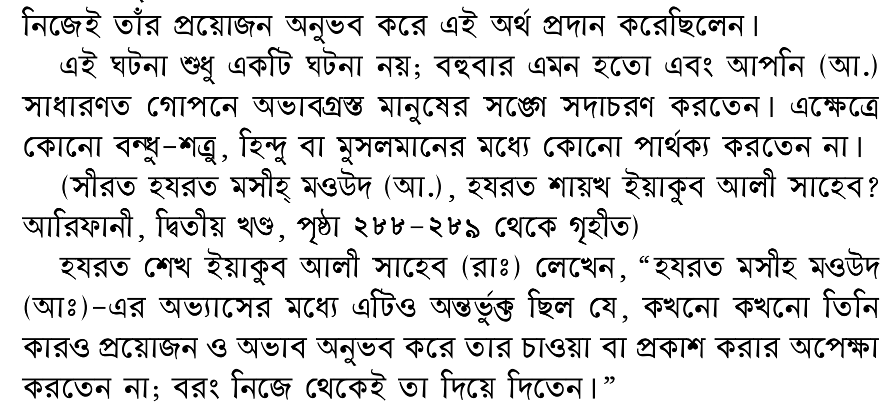

কিন্তু আমার যেহেতু প্রয়োজন হতো না, তাই আমি কখনো গ্রহণ করিনি। তবে হযরত (আঃ)-এর দানশীলতার উদারতা এতই মহান ছিল যে, তিনি কোনো জিজ্ঞাসা ছাড়াই সবসময় তা আমার সামনে পেশ করতেন। আর শুধু আমার সঙ্গেই এমন আচরণ ছিল না, বরং তিনি অনেককেই দিয়ে থাকতেন। শাম ও আরব থেকে কিছু লোক আসতেন এবং হযরত (আঃ) তাঁদেরকে কখনো কখনো পথের সম্বল হিসেবে বেশ বড় অঙ্কের অর্থ দিয়ে দিতেন, কারণ হুযূর জানতেন যে তাঁরা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন।"

(সীরতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রাঃ) আরিফানী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৯)

অনুরূপভাবে শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রাঃ) লেখেন, "অনেক সময় এমন ধরনের প্রার্থীও এসে যেতেন, যারা সাধারণত মুখে কিছু চাইতেন না; বরং একটি চিঠি লিখে দিতেন এবং কেউ জানতে পারত না যে তিনি কিছু চেয়েছেন। কিন্তু যখন হযরত আকদস (আঃ) ভেতর থেকে প্রার্থীর জন্য কিছু পাঠাতেন, তখন জানা যেত। অথবা কখনো ভেতরে যাওয়ার সময় বলে যেতেন, 'তোমরা বসো, আমি আসছি।' তখন কেউ কেউ এই ধারণায় অপেক্ষা করতেন যে, হযরত সাহেব (আঃ) আসবেন; কিন্তু দেখা যেত, তিনি প্রার্থীর জন্য তার প্রয়োজনীয় জিনিস-নগদ অর্থ অথবা কাপড়-নিয়ে আসছেন।"

(সীরতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রাঃ) আরিফানী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৪)

হযরত মুনশী জাফর আহমদ সাহেব (রাঃ) বলেন: "মিঞা জি নিজামুদ্দীন, কপুরথলার অধিবাসী, অত্যন্ত দরিদ্র মানুষ ছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে কাদিয়ান গিয়েছিলেন এবং দুই আনা হুযূর (আঃ)-এর কাছে নজরানা হিসেবে পেশ করেন। হুযূর (আঃ) 'জাযাকুমুল্লাহ' বলে সেই দুই আনা গ্রহণ করেন। কয়েক দিন পর নিজামুদ্দীন সাহেব যখন বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন হুযূর (আঃ) বললেন, 'অপেক্ষা করুন।' তিনি ভেতরে গিয়ে সাত অথবা আট টাকা নিয়ে এলেন এবং মিঞা জি নিজামুদ্দীনকে দিয়ে দিলেন।"

(আসহাবে আহমদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২১৫)

হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) লেখেন যে, "মুনশী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলভী লিখিতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে, মুনশী আলী গওহর সাহেব কপুরথলায় ডাকঘরে চাকরি করতেন। তাঁর পেনশন হয়েছিল আড়াই টাকা। অবসর গ্রহণের পর তাঁর সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। তিনি জলন্ধরে তাঁর বাসস্থানে চলে গেলেন। তিনি আমাকে চিঠি লিখলেন যে, তুমি যখন কাদিয়ানে যাবে, তখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও। তিনি অত্যন্ত একনিষ্ঠ আহমদী ছিলেন।"

তিনি বলেন, "অতঃপর আমি যখন কাদিয়ানে যাওয়ার জন্য রওনা হলাম, তাঁকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য জলন্ধরে গেলাম। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও অতিথিপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তিনি আমার জন্য অত্যন্ত ভালোভাবে খাবার রান্না করলেন এবং পরে আমি জানতে পারলাম যে, তিনি কোনো বাসনপত্র ইত্যাদি বিক্রি করে সেই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন...।"

এটাই ছিল সেই সাহাবীদের অবস্থাও, যাঁরা হযরত (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন: "আমি মুনশী আলী গওহর সাহেবের টিকিট নিজেই কিনে নিলাম। তিনি তাঁর ভাড়া দেওয়ার জন্য জোর করতে লাগলেন। আমি বললাম, এই টাকা আপনি হযরত সাহেব (আঃ)-এর খেদমতে পেশ করে দেবেন।" আমি তাঁর অবস্থা জানতাম। টিকিট আমি নিজের টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। তিনি যখন খুব জোর করতে লাগলেন, তখন আমি বললাম, "ঠিক আছে, তাহলে এই টাকা আপনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খেদমতে পেশ করে দেবেন।"

"অতঃপর তিনি দুই টাকা হযরত সাহেব (আঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন। আট-দশ দিন অবস্থান করার পর যখন আমরা ফিরে যাওয়ার অনুমতি নিতে গেলাম, তখন হুযূর (আঃ) অনুমতি দিলেন এবং মুনশী সাহেবকে বললেন, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন।' এরপর হুযূর (আঃ) দশ অথবা পনেরো টাকা নিয়ে এসে মুনশী সাহেবকে দিলেন। মুনশী সাহেব কাঁদতে লাগলেন এবং আরজ করলেন, 'হুযূর! আমার কি খেদমত করা উচিত, নাকি আমি হুযূরের কাছ থেকে গ্রহণ করব?' হযরত সাহেব (আঃ) আমাকে বললেন, 'ইনি আপনার বন্ধু, আপনি তাঁকে বোঝান।' এরপর আমার বোঝানোর পর যে, এর মধ্যে বরকত রয়েছে, অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করুন, তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং আমরা চলে এলাম। অথচ হযরত সাহেব (আঃ)-এর মুনশী সাহেবের আর্থিক অবস্থার ব্যাপারে মোটেই কোনো জ্ঞান ছিল না।" (সূত্র: সীরতে মাহদী, খণ্ড ২, অংশ ৪, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭, রেওয়ায়েত নং ১১২৩)

হযরত মুনশী জাফর আহমদ সাহেব (রাঃ) আরও লেখেন: হযরত আকদস (আঃ) তাঁর খাদেমদের মনোরঞ্জন ও তাদের মন ভালো রাখার প্রতি অত্যন্ত বেশি খেয়াল রাখতেন এবং হুযূর (আঃ) এজন্য নিজের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার ত্যাগ ও আত্মত্যাগ বাস্তবে প্রকাশ করতেন।

তিনি বলেন, একবার ঈদের দিন ছিল এবং আমার সফা, পাগড়ি, অর্থাৎ মাথায় বাঁধার কাপড়টি পরিষ্কার ছিল না। কারণ, আমরা যখনই আসতাম, এক-দুই দিনের অবসর বের করে আসতাম; কিন্তু কাদিয়ানে এলে হুযূর (আঃ) থাকার নির্দেশ দিতেন যে, এখানেই কয়েক দিন থাকো। তখন আমাদের চাকরিতে ফিরে যাওয়ার কথাও মনে থাকত না এবং আমরা সেখানেই থাকতাম। অনুরূপভাবে একবার আমরা এসেছিলাম এবং ঈদের দিন এসে গেল। আমি মাত্র একটি সফা, অর্থাৎ মাথায় বাঁধার কাপড় বা পাগড়ি নিয়ে এসেছিলাম। সেটি ময়লা হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, বাজারে গিয়ে কিনে নিয়ে আসি। অতঃপর আমি বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। হুযূর (আঃ) আমাকে দেখে ফেললেন। আর হুযূরের দূরদৃষ্টি তো আল্লাহপ্রদত্ত দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছ? আমি আরজ করলাম, "ঈদের দিন, আমার সফাটি ময়লা হয়ে গেছে। আমি বাজার থেকে কিনতে যাচ্ছি।"

তখনই সেখানে দাঁড়িয়ে হুযূর (আঃ) নিজের পবিত্র পাগড়ি খুলে আমাকে দিয়ে দিলেন। নিজের পাগড়ি খুলে দিয়ে বললেন, "এটি কি আপনার পছন্দ? আপনি এটি নিয়ে নিন। আমি অন্যটি পরব।"

এই ভালোবাসা ও স্নেহের যে প্রভাব আমার ওপর পড়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সেই পাগড়িটি গ্রহণ করলাম এবং হুযূর (আঃ) অনায়াসে বাড়িতে চলে গেলেন। পরে অন্য একটি পাগড়ি পরে সেখানে ফিরে এলেন।

(মাখুয, আসহাবে আহমদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬)

হযরত মিঞা খায়রুদ্দীন সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবারের কথা, তখনও হুযূর (আঃ) নিজের দাবী করেননি। হুযূরের বড় ভাইয়ের বিবাহ ছিল এবং তিনি কিছু ছাগল আনিয়েছিলেন, যেগুলো নঙ্গাল বাগবানাঁর এক ব্যক্তি চরাতেন। একদিন হুযূর (আঃ) বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন, সেই ব্যক্তি ছাগল চরাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেলেও ছিল এবং ছেলেটি খালি পায়ে ছিল। হুযূর (আঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিঞা! তুমি খালি পায়ে ঘুরছ। তোমার পায়ে কাঁটা বিঁধে না?"সে আরজ করল, "হুযূর! আমার জুতা নেই এবং আমার বাবা গরিব, তিনি কিনে দিতে পারেন না।"

হুযূর (আঃ) নিজের পা থেকে একটি জুতা খুলে বললেন, "এটি পরো। দেখো, তোমার পায়ে ঠিকমতো হয় কি না।" সে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, "আমি কীভাবে আপনার জুতা পরব?"হুযূর (আঃ) বললেন, "না!"এবং তাকে জোর দিয়ে বললেন, "পরো।" সে এক পায়ে জুতা পরল। হুযূর (আঃ) বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। তোমার পায়ে পুরোপুরি এসেছে।" এরপর আপনি (আঃ) অন্য পায়ের জুতাটিও খুলে বললেন, "এটিও পরো।" সে সেটিও পরে নিল। এতে হুযূর (আঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন, "ব্যস, এখন ঠিক আছে। তুমি এটি ব্যবহার করো।" অতঃপর তিনি (আঃ) এভাবে খালি পায়ে বাড়িতে ফিরে গেলেন। এটি সেই সময়ের ঘটনা, যখন হুযূর (আঃ)-এর বয়স সম্ভবত কুড়ি বা ত্রিশ বছর হবে।

(সূত্র: রেওয়ায়াতে আসহাবে আহমদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৮০)

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁর মুহসিন ও পথপ্রদর্শক হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর অনুসরণে দানশীলতা ও উদারতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তবে কখনো কখনো আমরা এটিও দেখতে পাই যে, কোনো হিকমত ও কল্যাণের কথা বিবেচনা করে তিনি প্রার্থীকে দেওয়া থেকেও বিরত থাকতেন।

এ সম্পর্কে শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রাঃ) লেখেন: "তিনি ১৮৮৯ সালে, যে বছর বায়আতের বছর, লুধিয়ানায় অবস্থান করছিলেন। এক সময় তাঁর কাছে একজন প্রার্থী এসে বলল যে, আমার একজন আত্মীয় মারা গেছেন। কাফন-দাফনের জন্য আমার কাছে কোনো ব্যবস্থা নেই।" সে কিছু রৌপ্য ও তামার মুদ্রা একটি পাত্রে রেখেছিল, যাতে দেখাতে পারে যে কতটুকু চাঁদা সংগ্রহ হয়েছে। অর্থাৎ সে চাঁদা চেয়ে চেয়ে কোনোভাবে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করছিল, কিন্তু আরও প্রয়োজন ছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) শ্রদ্ধেয় হযরত কাজী খাজা আলী সাহেবকে, যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং হযূরের পথে আত্মোৎসর্গকারী বুযুর্গ ছিলেন, বললেন, "কাজী সাহেব, তার সঙ্গে গিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করে দিন।" অর্থাৎ কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে; তার যে সমস্ত প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলো পূরণ করে দিন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস এমন ছিল না; সাধারণত কেউ উপযুক্ত মনে হলে যা চাইত, তিনি দিয়ে দিতেন। কিন্তু এখানে আমরা তাঁর অভ্যাসের বিপরীত একটি নতুন বিষয় দেখতে পেলাম। এই নির্দেশে খাদেমরাও বিস্মিত হলেন। কাজী সাহেবও জিজ্ঞাসা করলেন না যে কী দিতে হবে; বরং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন এবং তাকে বললেন, "চলুন ভাই, আমি গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

সেই প্রার্থী কাজী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর কাজী সাহেব হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললেন, "হযরত! সে তো বড় প্রতারক ছিল। পথে গিয়ে সে আমার কাছে অনুনয়-বিনয় শুরু করল, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি যাবেন না, যা দেওয়ার এখানেই দিয়ে দিন।' আমি বললাম, 'আমাকে তো নিজে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তোমার কাছে যা আছে আমাকে দাও, আর যা খরচ হবে আমি করব।' অবশেষে সে যখন

দেখল যে আমি কিছুতেই ফিরে আসছি না, তখন হাত জোড় করে লজ্জিত হয়ে বলল, 'কেউ মারা যায়নি এবং কাফন-দাফনেরও কোনো প্রয়োজন নেই। এটি আমার পেশা। এখন আমার পর্দা ফাঁস করবেন না। আপনি ফিরে যান এবং আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর এ কাজ করব না।'

প্রার্থীদের মধ্যে কখনো কখনো এমন অবস্থাও দেখা যেত। কাজী সাহেব যখন ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, স্বাভাবিকভাবেই তা শুনে হাসিও পেল। কিন্তু হুযূরের মুমিনসুলভ দূরদৃষ্টি ও নৈতিকতারও এক অসাধারণ প্রভাব অনুভূত হলো। তিনি সুধারণা রেখে তাকে কোনো জবাব দিলেন না; বরং এমন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, যার ফলে তার সংশোধনও হয়ে গেল এবং অনুপযুক্ত স্থানে হুযূরের অর্থ ব্যয় করারও প্রয়োজন হলো না।

(সীরতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব আরিফানী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৭-২৮৮)

এর অনুরূপ বা এই ঘটনাই হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আঃ) নিজেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "লুধিয়ানায় একজন প্রার্থী আমার কাছে এসেছিল এবং প্রকাশ করেছিল যে, একজন লোক মারা গেছে। তার কাফনের জন্য ব্যবস্থা করছি। চার আনা কম পড়েছে। একজন ব্যক্তি বলল, প্রথমে দেখা উচিত যে মৃতদেহটি কোথায় আছে; তারপর তার পূর্ণ সাহায্য করা উচিত। অতঃপর সেই ব্যক্তি তার সঙ্গে গেল। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর প্রার্থী পালিয়ে গেল, কারণ পুরো ঘটনাটিই ছিল মিথ্যা বানানো কাহিনি।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৫, সংস্করণ ২০২২)

অনুরূপভাবে একবার কোথাও থেকে একটি চিঠি এল যে, আমরা একটি মসজিদ নির্মাণ করতে চাই এবং বরকতের উদ্দেশ্যে আপনার কাছ থেকেও কিছু চাঁদা চাই। হযরত আকদস (আঃ) বললেন, "আমরা দিতে পারি এবং এটি এমন কোনো বড় বিষয়ও নয়। কিন্তু যখন আমাদের নিজেদের এখানেই বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কাজের জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, যার তুলনায় এ ধরনের খরচে অংশগ্রহণ করা অপচয় বলে মনে হয়, তখন আমরা কীভাবে এতে অংশগ্রহণ করতে পারি? এখানে আল্লাহ যে মসজিদ নির্মাণ করছেন, সেটিই মসজিদে আকসা; সেটিই সর্বাগ্রে। এখন মানুষের উচিত এর জন্য অর্থ পাঠিয়ে সওয়াবের অংশীদার হওয়া।"

হুযূর (আঃ) বললেন: "আমাদের বন্ধু সে-ই, যে আমাদের কথা মেনে চলে; সে নয়, যে নিজের কথাকে অগ্রাধিকার দেয়।"

এরপর তিনি উদাহরণ দিয়ে বললেন: "হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)-এর কাছে একজন ব্যক্তি এসে বলল, আমরা একটি মসজিদ নির্মাণ করতে যাচ্ছি, আপনিও এতে কিছু চাঁদা দিন। তিনি অজুহাত দেখিয়ে বললেন, আমি এতে কিছু দিতে পারব না। অথচ তিনি চাইলে অনেক কিছুই দিতে পারতেন। সেই ব্যক্তি বলল, আমরা আপনার কাছে অনেক কিছু চাই না, শুধু বরকতের জন্য কিছু দিয়ে দিন। অবশেষে তিনি এক-দুই আনার কাছাকাছি একটি মুদ্রা দিলেন।"

সন্ধ্যাবেলায় সেই ব্যক্তি সেই দুই আনা নিয়ে ফিরে এসে বলল, "হুযূর, এটি তো অচল মুদ্রা।"

তখন ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, "বেশ হয়েছে। আসলে আমার মন চাইছিল না যে আমি কিছু দিই তাতে-তোমরা যেভাবে মসজিদ নির্মাণ করছ। মসজিদ তো অনেক রয়েছে এবং এতে আমার অপচয় মনে হচ্ছিল।"

(সূত্র: মালফুযাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১, সংস্করণ ২০২২)

তোমরা নামাজ পড়ো না, অথচ লোক দেখানোর জন্য মসজিদ নির্মাণ করো।

শিশুদেরও তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দান করতেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) লিখেছেন যে, বিবি রানি, মাওসিয়া, আজিজ বেগম সাহেবার মাতা, হাকিম মুহাম্মদ উমর সাহেবের স্ত্রী, কাদিয়ানের অধিবাসী, বর্ণনা করেছেন:

"আমি ১৯০১ সালে চিঠির মাধ্যমে বয়আত করেছিলাম। যেহেতু আমার মেয়ে আজিজা বেগম, হাকিম মুহাম্মদ উমর সাহেবের স্ত্রী, কাদিয়ানে ছিলেন, তাই আমিও ১৯০২ সালে কাদিয়ানে আসার আগ্রহ অনুভব করি। আমার সঙ্গে আমার ছোট মেয়েটিও ছিল। হযরত সাহেব (আঃ) সকালে কোনো এক সময়ে যখন বাগানের দিকে বেড়াতে বের হতেন, আমিও প্রায়ই তাঁর সঙ্গে যেতাম। বয়স বেশি হওয়ার কারণে এবং অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় অনেক কথা মনে নেই..." তিনি লিখেছেন। কিন্তু একটি বিষয় তাঁর মনে আছে। তিনি বলেন:

"একবার সকালে যখন হযরত সাহেব (আঃ) খাবার খাচ্ছিলেন, আমিও সেখানে এসে উপস্থিত হলাম। আমার ছোট মেয়ে কাঁদতে শুরু করল। হযরত সাহেব (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?' আমি আরজ করলাম, 'সে রুটি চাইছে।' তিনি রুটি আনিয়ে তাকে দিলেন, কিন্তু মেয়েটি চুপ হলো না; সে তখনও কাঁদতে থাকল। হুজুর (আঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে আমি আরজ করলাম, 'সে সেই রুটিই চাইছে, যেটি হুজুর (আঃ) নিজে খাচ্ছেন।' তখন হুজুর (আঃ) যে রুটি নিজে খাচ্ছিলেন, সেটিই তাকে দিয়ে দিলেন। মেয়েটি সেই অল্প রুটিটি নিয়ে চুপ করে খেতে লাগল।"

(সীরাতুল মাহদী, খণ্ড ২, অংশ ৫, পৃষ্ঠা ১৪৮, বর্ণনা নং ১২৮১)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করাতেন, তখন কাজের মানুষের সুবিধার প্রতিও খেয়াল রাখতেন।

ডাক্তার আতরুদ্দীন সাহেব বলেন, হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রাঃ), যিনি তখন শিশু ছিলেন, একবার কোথাও বাইরে চলে গিয়েছিলেন। যখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে এ বিষয়ে জানানো হলো, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর খাদেমকে বোর্ডিং হাউসে পাঠিয়ে খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে এমন কয়েকজন বোর্ডারকে ডাকতে বললেন। সেখানে যে ছাত্ররা পড়ত, তাদের ডেকে পাঠানো হলো। তখন কিবলা ভাই আবদুর রহিম সাহেব, যিনি নওমুসলিম বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন, বলেন: "তিনি আমাকে এবং আরও তিন-চারজন ছেলেকে পাঠালেন এবং এই দলের নেতা বা ক্যাপ্টেন আমাকে বানালেন। আমরা যখন হুজুর (আঃ)-এর কাছে গেলাম, তখন হুজুর অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন, 'তোমাদের অনেক কষ্ট হবে। আমি তোমাদের ডেকেছি এবং তোমাদের একটি কাজে যেতে হবে। সম্ভবত তোমাদের দেরিও হয়ে যেতে পারে এবং ফিরে আসতে হতে পারে, আর তোমাদের ক্ষুধাও লাগতে পারে।' তাই হুজুর (আঃ) আমাকে অনেকগুলো রুটি দিলেন এবং তরকারি ও ডালের মতো রান্না করা খাবারও নিজে নিয়ে এসে আমাদের দিলেন। কারণ আমরা খোঁজ করতে যাচ্ছিলাম এবং পথে প্রয়োজন হতে পারে।"

তিনি বলেন, "যাই হোক, আমরা রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। এমন সময় কিবলা শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব আরফানি (রাঃ), মীর সাহেব (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে ঠিক তখনই উপস্থিত হলেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলেন। ফলে আমাদের আর যেতে হয়নি। কিন্তু এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তাঁর খাদেমদের প্রতিও স্নেহ ও মমতা প্রকাশ পায়।"

(মাখুয, রেওয়ায়াতে আসহাবে আহমদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪৬, হযরত ডাক্তার আতরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-এর বর্ণনা)

হযরত মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব, ভাঙ্গো সাহেবের পুত্র, যিনি কাদিয়ান সংলগ্ন কাদিরাবাদ গ্রামে বসবাস করতেন, বর্ণনা করেন:

"অনেকবার হযরত সাহেব (আঃ) নিজের বাড়ি থেকে খাবার ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আমাদের গ্রামের মসজিদে খেতেন এবং আমাদেরও তা দিতেন।"

[রেওয়ায়াতে আসহাবে আহমদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭৮, হযরত মুহাম্মদী]

স্ত্রীর ঋণও পরিশোধ করা জরুরি।

গত খুতবায় আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম যে, লঙ্গরের খরচ বেড়ে গেলে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হযরত আম্মাজান (রাঃ)-এর গহনা বিক্রি করে সেই খরচ পূরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে গত সপ্তাহে কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে, এর অর্থ কি এই যে, প্রয়োজন হলে স্ত্রীর গহনা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেই অর্থ স্বামীর ব্যবহারে আসতে পারে?

স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং পরে তা পরিশোধ করতেন।

এ সম্পর্কে আরও একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) লিখেছেন যে, হযরত হামিদ আলী সাহেব (রাঃ)-এর বিধবা স্ত্রী রাসুল বিবি সাহেবা বর্ণনা করেছেন:

"দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হযরত উম্মুল মুমিনীন (রাঃ)-এর কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়েছিলেন।"

যে প্রথম ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছিল, সেখানেও ঋণ নেওয়া বা বন্ধক রাখার কথা ছিল। পরে যখন বন্ধক ছাড়ানো হয়েছিল, তখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-ই তা পরিশোধ করেছিলেন।

যাইহোক, বর্ণনাকারী বলেন: "তিনি টাকা ঋণ নিয়ে গম ক্রয় করেছিলেন এবং বাড়ির খরচ পূরণ করেছিলেন।" লঙ্গরের খরচও পূরণ করা হয়েছিল। এটি শুধু বাড়ির খরচের জন্য ছিল না; লঙ্গরের জন্যও অনেক খাবার হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বাড়ি থেকেই রান্না করা হতো।

"এরপর তিনি চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেবের কাছ থেকে হাফেজ হামিদ আলী সাহেবের মাধ্যমে ৫০০ টাকা আনালেন এবং কিছু ঘিয়ের পাত্রও আনালেন। টাকা আসার পর তিনি হযরত উম্মুল মুমিনীন (রাঃ)-এর ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।"

তিনি বলেন, "আমি বহুবার দেখেছি, হাফেজ সাহেব একের পর এক টাকার থলে নিয়ে আসতেন।" তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং প্রয়োজন ছিল। "রাতে সেগুলোর পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হতো।" (সীরাতুল মাহদী, খণ্ড ২, অংশ ৪, পৃষ্ঠা ১১৭, বর্ণনা ১১৪৫)

আর সেই ঋণ ঋণই হতো, মানুষের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য ছিল না। যাই হোক, হযরত আম্মাজান (রাঃ)-এর ঋণ হোক কিংবা অন্য কারও কাছ থেকে নেওয়া ঋণ হোক, তিনি তা পরিশোধ করতেন।

হযরত বাবু গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন:

"কাদিয়ানে অনেক সময় গ্রাম্য মহিলারা, যাদের হাত গোবর দিয়ে ভরা থাকত এবং কাপড়ও ময়লা-নোংরা থাকত, হুজুর (আঃ)-এর সেবায় উপস্থিত

→ শেষাংশ ১২ পাতায়....

সেই দিনটি

হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রা.)

হে প্রিয়! প্রত্যেক সত্যসন্ধানী অনুসন্ধানকারীর জীবনে এমন একটি দিন আসে, যে দিনটি তার ভাগ্যের ফয়সালার দিন হয়ে থাকে। আমি বলতে পারি না, এর কী নাম রাখা উচিত। "সেই দিন-এই পরিভাষাটিই অন্য যেকোনো পরিভাষার তুলনায় আমার বেশি পছন্দ। এর আগে যে-ই তার নাম রাখুক না কেন, সে প্রথমে অন্ধকার ও তমসার মধ্যে থাকে। তার বিবেক তাকে মাঝে মাঝে জাগ্রত করে, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর রসূল তাকে বারবার ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তোলেন এবং অন্যদিকে বিরোধী শক্তিগুলোও তাদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। সে পড়ে যায় এবং আবার উঠে দাঁড়ায়। হোঁচট খায় এবং নিজেকে সামলে নেয়। টলমল করে এবং আবার দৃঢ় হয়। অবশেষে চিরন্তন সৌভাগ্য ও ঐশী অনুগ্রহ তার হাত ধরে এবং দীর্ঘদিনের এই সংগ্রামের পর একদিন হঠাৎ মালায়ে আ'লা থেকে তার কাছে এই আওয়াজ আসে:

আলাম ইয়ানি বি যিকরিল্লাহ'

"আল্লাহর স্মরণের জন্য কি এখনও সময় হয়নি?

তারপর আর কী! হঠাৎ একটি ফয়সালা হয়ে যায়। মানব-আত্মার রাজ্যে এক মহা-প্রলয় সংঘটিত হয়। শয়তানি শক্তিগুলো রহমানী তজ্জল্লির সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে এবং সালেকের কল্যাণের ফেরেশতা তার আত্মার পরীক্ষা নেয়। সে এভাবে প্রশ্ন করে:

দেখো, হে বান্দা! তোমার প্রতিপালক তোমাকে নিজের দিকে ডাকছেন। তুমি কি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ভবিষ্যতে সর্বদা আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত?

এ সময় আত্মার গভীর থেকে উত্তর আসে:

"লাব্বাইক! হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

তারপর প্রশ্ন হয়: তুমি কি প্রত্যেক কঠিন ও সহজ অবস্থায়, প্রত্যেক সংকট ও স্বাচ্ছন্দ্যে, সম্মান ও অসম্মানে তোমার প্রতিপালকের সঙ্গে বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করছ?

উত্তর আসে: "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি অঙ্গীকার করছি।"

তারপর প্রশ্ন হয়: তুমি কি তোমার ধন-সম্পদ, সম্মান, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, জাতি, স্থাবর অস্থাবর সম্পদ, ব্যবসা ও চাকরিকে এই পথে কোনো সম্মান বা গুরুত্ব দেবে?

উত্তর আসে:"কখনোই নয়। কখনোই নয়।"

এরপর বিস্তারিত বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়। যেমন, যদি তোমার মা-বাবা, স্ত্রী, সন্তান এবং বন্ধুরা এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তুমি কতদূর পর্যন্ত তাদের কথা মানতে প্রস্তুত থাকবে?

উত্তর: "আমি তাদের ছেড়ে দেব এবং যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের কুরবান করতে হয়, তাহলে কোনো দ্বিধা ছাড়াই কুরবান করে দেব। আমার সামনে কি হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মহান কুরবানির দৃষ্টান্ত নেই?

প্রশ্ন:যদি তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর পথে দিতে হয়?

উত্তর:"সেগুলো এখনই উপস্থিত। এগুলো আগে যেমন আমার ছিল না, ভবিষ্যতেও আমার হবে না। আমাকে অনাহারে থাকতে হয়, আকাশের নিচে জীবনযাপন করতে হয়, অনাবৃত থাকতে হয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়-আমি তা মেনে নিতে প্রস্তুত; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমি আমার আল্লাহকে ছাড়তে পারি না।"

প্রশ্ন:যদি ব্যবসা, চাকরি অথবা জীবিকা এই পথে বিপদের সম্মুখীন হয়, তাহলে তুমি কী করবে?

উত্তর:"আমি ক্ষুধার্ত থাকব। কষ্টে কষ্টে মৃত্যুবরণ করব। ভিক্ষা করে জীবনধারণ করব। ঘাসপাতা খেয়ে থাকব। কিন্তু আমার প্রভুর আঁচল ছাড়তে পারি না এবং ছাড়বও না। শি'বে আবি তালিবের তিন বছরের অবরোধের সময় কি একটি পবিত্র জামাত গাছের পাতা এবং শুকনো চামড়ার টুকরো পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেয়ে নিজেদের পেট ভরাত না? তাও কি একটানা দীর্ঘ তিন বছর ধরে?

প্রশ্ন:যদি তাঁর পক্ষ থেকে রোগব্যাধি অথবা শারীরিক কষ্ট আসে, তাহলে তুমি কি অভিযোগ করবে?

উত্তর:"কখনোই নয়। সারাজীবন যদি আমি এসব বিপদে পরিবেষ্টিত থাকি এবং সবচেয়ে কঠিন দুঃখ-কষ্টেও আক্রান্ত থাকি, তবুও তাঁর মালিকানার অধিকার এবং প্রিয়তমের অধিকার আমার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমি সর্বদা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকব এবং কখনো অভিযোগ করব না। অভিযোগ করা তো দূরের কথা, যদি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমাকে নিজের হাতে আমার শরীরের প্রতিটি টুকরো এবং প্রতিটি শিরা-উপশিরা ভোঁতা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে হয়, তবুও আমি মন-প্রাণ দিয়ে প্রস্তুত। বরং এসব বিষয় আমাকে কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে আনন্দ দেবে।

এ কি সেই পথ নয়, যে পথে আমার পূর্বে আমারই মতো মানুষদের করাত দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিরে ফেলা হয়েছে? তাদের উত্তপ্ত বালু ও জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে। তাদের চামড়া তুলে নেওয়া হয়েছে। তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। অথচ তারা 'আহ্' পর্যন্ত করেননি। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের ওপর, কারণ তারা আজ আমার পথপ্রদর্শক।"

প্রশ্ন:সম্মান একটি বড় জিনিস। তুমি কি প্রত্যেক ধরনের অপমানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত মনে কর?

উত্তর:"হ্যাঁ! যদি এই পথে আমাকে বলা হয় যে, তুমি ঝাড়ু নিয়ে প্রতিদিন বাজার পরিষ্কার করো, তাহলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। যদি মালিকের সন্তুষ্টি এতে থাকে যে, আমি শহরের চত্বরে বসে থাকব এবং প্রত্যেক আগন্তুক ও পথচারী আমার মাথায় ধুলো ছিটিয়ে চলে যাবে, অথবা যে ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাবে সে আমার মুখে থুতু দিয়ে চলে যাবে, তাহলেও আমি সেই অপমান মেনে নেব। আর যদি সারাজীবন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে মুখোমুখি গালাগালি করা হয়, তাহলেও আমি তা শুনতে প্রস্তুত। কিন্তু এ জন্য প্রস্তুত নই যে, আমার প্রভু, আমার প্রিয়তম এক মুহূর্তের জন্যও আমার ওপর অসন্তুষ্ট হন।

আমার পূর্বে কি এমন লোকেরা চলে যাননি, যাদের নাকে লাগাম পরিয়ে প্রকাশ্য বাজারে অপমান করা হয়েছে? অথবা তারা, যাদের পবিত্র মুখমণ্ডলে কাঁটার মুকুট পরিয়ে থুতু দেওয়া হয়েছে? অথবা তারা, যাদের পিঠ ও ঘাড়ের ওপর মসজিদের অভ্যন্তরে, ঠিক সিজদার অবস্থায়, নোংরা আবর্জনা রাখা হয়েছে?

শেষ প্রশ্ন:নিশ্চয়ই তুমি এসব কিছু করতে পারবে; কিন্তু এর চেয়েও কঠিন পরীক্ষা হলো কামনা-বাসনা ও অভ্যাসের পরীক্ষা। এতে তুমি কীভাবে সফলতা অর্জন করবে?

উত্তর:"নিশ্চয়ই আমি স্বীকার করি যে, কামনা-বাসনার প্রবল আকর্ষণ অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু পৃথিবীতে কি এমন মানুষ আসেননি, যারা প্রত্যেক যুগে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন? আর পৃথিবীতে কি আজও হাওয়া আলাইহাস সালামের লক্ষ লক্ষ কন্যা এমন নেই, যাদের পবিত্রতা ও সতীত্বের ব্যাপারে ফেরেশতারা শপথ করতে পারেন? আমি কি পুরুষ হয়ে নারীদের থেকেও অধম হয়ে গেলাম?

আর অভ্যাসের ব্যাপারে আমি স্বীকার করি যে, পর্বত ভেঙে ফেলা দৃঢ়মূল অভ্যাস ভাঙার তুলনায় অনেক সহজ। একটি উটের ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে চলে যাওয়া যত সহজ, পুরোনো কু-অভ্যাসগুলোকে একেবারে মুছে ফেলা তার চেয়েও কঠিন। কিন্তু আমি অঙ্গীকার করছি যে, এগুলোর বিরুদ্ধে আমি নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাব, সর্বদা নিজের আত্মসমালোচনা করতে থাকব এবং সবসময় আমার আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকব। আর আমি বিশ্বাস করি, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন এবং আমার প্রচেষ্টাকে সফল করবেন।"

এখন, হে শ্রোতা, শোনো! যখন সত্যিই নফসের এই অবস্থা হয়ে যায় এবং মানবাত্মার প্রস্তুতি এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন আকাশ থেকে এক বিশেষ কবুলিয়ত অবতীর্ণ হয়। সেই বান্দার সঙ্গে তখন যে আচরণ করা হয়, তা শুধু শুনে বোঝা যায় না। তা তখনই বোঝা যায়, যখন কারও জীবনে সেই পবিত্র দিনটি আসে এবং তখন তার নফসের ফয়সালা আল্লাহতাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে যায়।

অতএব, হে প্রিয়! যদি তোমার ওপর সেই সময়টি এখনও না এসে থাকে, তাহলে তুমিও দোয়া কর এবং চেষ্টা কর, যেন "সেই দিন-সেই পবিত্র দিন, সেই চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, তোমার জীবনের সেই ইয়াওমুল ফুরকান-তোমার ভাগ্যে জুটে যায়।

আমীন।

(মুদ্রিত: আলফজল, কাদিয়ান, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয়আল্লাহ তিনি, যিনি পরম রিযকদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল,'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Berhampur, Murshidabad

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

তারবিয়ত বিভাগ

হুজুর (আ.) বলেন, "খুদ্দামদের তরবিয়ত করুন। বিবাহ ভেঙে গেলে সেখানে সংশোধনের চেষ্টা করুন। পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ যতটা সম্ভব কমাতে হবে। যেখানে ছেলেরা ভুল করছে, তাদের বুঝিয়ে সংশোধন করুন এবং তাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দিন।"

নামাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে মুহতামিম তারবিয়ত জানান, ৪৭% খুদ্দাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন।

হুজুর (আ.) বলেন, "যারা দুর্বল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং বারবার নামাজের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিন। তাদের বোঝান, তোমরা এই দেশে এসেছ কারণ নিজ দেশে স্বাধীনভাবে নামাজ পড়তে পারতে না। এখন এখানে এসে আল্লাহর এই অনুগ্রহের শোকর আদায় করার পরিবর্তে আল্লাহকেই ভুলে গেছ। যদি আল্লাহকে ভুলেই যেতে, তবে নিজ দেশেই থাকতে। নামাজ না পড়া এবং মসজিদে না আসা তো সেখানেও সম্ভব ছিল। তাহলে এখানে আসার প্রয়োজন কী ছিল?"

তিনি আরও বলেন,"খুদ্দামদের প্রতিদিন নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতে উদ্বুদ্ধ করুন। একই সঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রতিও উৎসাহিত করুন। তাঁর গ্রন্থগুলো ইন্টারনেটেও সহজলভ্য।"

এরপর হুজুর (আ.) বলেন,

"হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছেন-

'যুবকদের সংশোধন ছাড়া কোনো জাতির সংশোধন সম্ভব নয়।' এই বাক্যটি নিয়ে ব্যাজ তৈরি করুন এবং প্রত্যেক খাদিম যেন সেই ব্যাজ ধারণ করে।"

অন্যান্য নির্দেশনা

মুহতামিম উমুমীর উদ্দেশে হুজুর (আ.) বলেন,

"এই সময় আপনি বিভিন্ন দায়িত্ব ও ডিউটি পালন করছেন।"

মুহতামিম সেহহতে জিসমানির উদ্দেশে তিনি বলেন,

"এখানে তো আপনাদের অনেক খোলা জায়গা রয়েছে। নিয়মিত খেলাধুলার ব্যবস্থা করা উচিত। এতে মসজিদের সঙ্গে সম্পর্কও বাড়বে এবং নামাজে উপস্থিতিও বৃদ্ধি পাবে।"

১৯, অক্টোবর, শনিবার, ২০১৩

ন্যাশনাল মাজলিসে আমিলা খুদ্দামুল আহমদিয়া অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে হুযুর আনওয়ার (আই.)-এর বৈঠক

হুযূর আনওয়ার, (আই.) মুহতামিম ওয়াকারে আমল-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন: "এখানে মসজিদের অনেক বড় এলাকা রয়েছে। প্রায় ত্রিশ একর। তাহলে কি এখানে খুদ্দামরা ইত্যাদি ঘাস কাটে এবং গাছপালা, ফুল ইত্যাদি লাগায়?" তিনি জানান যে, তারা মেশিন ইত্যাদি সংগ্রহ করে ঘাস কাটেন, এলাকার পরিচ্ছন্নতা করেন এবং বাগানের কাজও করেন।

মুহতামিম তাহরিকে জাদীদ-এর কাছে হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, "আপনাদের জামাআত খুদ্দামুল আহমদিয়াকে কী লক্ষ্য দিয়েছে? খুদ্দামদের জন্য পৃথক লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। খুদ্দামরা এ বছর কত চাঁদা সংগ্রহ করেছে? অথবা আপনারা কি প্রত্যেক খাদেমকে তাহরিকে জাদীদের চাঁদার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছেন?

মুহতামিম তাহরিকে জাদীদ আরজ করেন যে, খুদ্দামুল আহমদিয়ার জন্য কোনো পৃথক লক্ষ্য নেই। এর উত্তরে হুযূর আনওয়ার বলেন, "খুদ্দামদের জন্য পৃথক লক্ষ্যও নির্ধারণ করা উচিত।"

মুহতামিম আতফাল তাঁর রিপোর্ট পেশ করে জানান যে, এটি তাঁর প্রথম বছর। এ কথা শুনে হুযূর আনওয়ার বলেন, "আপনার কাজকে সংগঠিত করুন এবং আতফালদের কাছ থেকেও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা নিন। প্রত্যেক শিশুকে এই চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করুন।"

মুহতামিম তবলীগ-এর কাছে হুযূর আনওয়ার বায়আতের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, সারা বছরে মাত্র একটি বায়আত হয়েছে এবং এখনও তিনি জানেন না যে কে বায়আত করেছে এবং সে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত।

এতে হুযূর আনওয়ার বলেন, "একদিকে সারা বছরে খুদ্দামুল আহমদিয়ার মাত্র একটি বায়আত হয়েছে, আর অন্যদিকে তিন মাস পরেও আপনি জানেন না যে কে বায়আত করেছে?

হুযূর আনওয়ার বলেন, "আপনার কাজকে সংগঠিত করুন। এখন আপনাদের এক বছরে ২৫টি বায়আত করাতে হবে। এর জন্য এখন থেকেই চেষ্টা করুন এবং নিয়মিত কর্মসূচি তৈরি করুন, পরিকল্পনা করুন এবং তবলীগের কাজকে সুসংগঠিত করুন। প্রত্যেক মজলিসের দায়িত্বে দিন যে তবলীগ করতে হবে এবং বায়আত করাতে হবে।"

মুহতামিম স্থানীয়-এর কাছে হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার দায়িত্বে কি শুধু মসজিদের এলাকা রয়েছে, নাকি সমগ্র গ্রেটার সিডনি?" তিনি জানান যে সমগ্র সিডনি তাঁর দায়িত্বে।

হুযূর আনওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "আপনার এলাকা শুধু মসজিদের চারপাশে দশ মাইলের মধ্যে রাখুন। সিডনির বাকি এলাকায় পৃথক মাজলিস ও কিয়াদত তৈরি করুন। মসজিদের চারপাশের দশ মাইল এলাকার আপনি দায়িত্বশীল হবেন এবং বাকি প্রত্যেক মাজলিসের কায়েদ দায়িত্বশীল হবেন। এভাবে আরও উত্তমভাবে এবং তৎপরতার সঙ্গে কাজ হবে।"

মুহাসিব তাঁর রিপোর্ট পেশ করে জানান যে তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং এখনও নিজেই কাজ বুঝছেন। এতে হুযূর আনওয়ার বলেন:

"আপনি এখনও নিজেই বুঝছেন, তাহলে অন্যদের কী বোঝাবেন?

মুহতামিম উমূরে তলাবা-কে সম্বোধন করে হুযূর আনওয়ার বলেন, "আপনার ছাত্রদের সংগঠিত করুন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'আহমদিয়া মুসলিম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করুন, যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করবে। ধর্মীয় ও দ্বীনি বিষয়ও রাখা যেতে পারে এবং অন্যান্য গবেষণামূলক বিষয়ও রাখা যেতে পারে। এর মাধ্যমে তবলীগের পথও খুলবে এবং জামাআতের পরিচিতিও বৃদ্ধি পাবে।"

মুহতামিম তবিয়তে নওমুবায়েঈন জানান যে বর্তমানে এগারোজন নওমুবায়েঈন প্রশিক্ষণাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন সিডনির এবং বাকিরা দূরবর্তী মাজলিসের।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার কি তাঁদের সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে?

তিনি জানান যে মাজলিসের কায়েদগণ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তাঁদের মধ্যে চারজন পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্পর্কিত।

হুযূর আনওয়ার বলেন, "তামিল ভাষাতেও আমাদের সাহিত্য রয়েছে। তাঁদের দিন। তাঁদের সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সম্পর্ক থাকা উচিত এবং তাঁদের নিয়মিতভাবে আপনাদের ব্যবস্থার অংশ করে রাখুন।"

মুহতামিম ইশাআত-এর কাছে হুযূর আনওয়ার খুদ্দামদের পত্রিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান যে তাঁরা 'আল-মসরূর' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

হুযূর আনওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তবলীগের কর্মসূচি ভালোভাবে তৈরি করুন এবং লক্ষ্যও ভালো রাখুন। এরপর এর নিয়মিত ফলো-আপ হতে হবে।"

অনুরূপভাবে তিনি বলেন, "তরবিয়তের যে কর্মসূচি তৈরি করবেন, তাতে নামাজ কায়েম করা এবং কুরআন শরিফ তিলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ দিন। আপনারা কি কখনও এটাও পর্যালোচনা করেছেন যে, এমটিএ-তে কতজন খুদ্দাম জুমার খুতবা শোনে?

হুযূর আনওয়ার বলেন, "যেসব আমিলা সদস্য মাসে তিনটি খুতবা শোনেন, তারা হাত উঠান।" এ কথায় সমস্ত আমিলা সদস্য হাত উঠান। হুযূর আনওয়ার এ বিষয়টিও জানতে চান যে, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কতজন খুতবা শোনেন।

হুযূর আনওয়ার নির্দেশ দেন, "ছুটির দিনে নিজেদের ঘরে সন্তানদের ক্লাস নিন এবং তাদের দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দিন।"

নওমুবায়েঈন কতদিন পর্যন্ত নওমুবায়েঈন থাকেন-এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনওয়ার বলেন:

"আমি আমার মিটিংগুলোতে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে বছরে দশবার বলে থাকি যে, এটি তিন বছরের জন্য।"

হুযূর আনওয়ার বলেন:"যে ব্যক্তি বায়আত করে, সে আহমদী। তাকে দ্রুত গধরহ ঝঃৎবধস-এ আসা উচিত এবং জামাআতের ব্যবস্থার অংশ হওয়া উচিত।"

হুযূর আনওয়ার বলেন:"যেহেতু বিপুল সংখ্যক বায়আত হয়, তাই নওমুবায়েঈনদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ তৈরি করা হয়েছে, যাতে এই তিন বছরের সময়কালে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের দেখাশোনা করা যায় এবং তাঁদের নিয়মিতভাবে জামাআতের ব্যবস্থার অংশ করা যায়।"

হুযূর আনওয়ার বলেন:"ইউকেতে একজন তরুণ ইংরেজ, Jonathan Butterworth, দুই বছর আগে আহমদী হয়েছিল। এখন সে এমটিএর অনুষ্ঠানেও আসে এবং এ বছর ইউকের ন্যাশনাল আমিলায় নওমুবায়েঈনদের জন্য সেক্রেটারি তরবিয়ত নির্বাচিত হয়েছে। যদি কেউ ভালোভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করে প্রস্তুত হয়ে যায়, তাহলে তাকে গধরহ ঝঃৎবধস-এ এনে কাজে লাগানো যেতে পারে।"

হুযূর আনওয়ার বলেন:"যেখানে নওমুবায়েঈনদের সংখ্যা বেশি, সেখানে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম তৈরি করে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক, যাতে তাঁরা দ্রুত জামাআতের ব্যবস্থায় একীভূত হতে পারেন।"

শেষাংশ ১০ পাতায়....

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

এখানে এই কথাটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পবিত্র কুরআন শরীফ তার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে যে, এর মধ্যে পূর্ববর্তী শিক্ষাসমূহের সকল চিরন্তন সত্য এবং সুদৃঢ় ও স্থায়ী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, এক অনন্য পরিপূর্ণতার রূপে উপস্থাপন করেছে এবং এই দিক থেকে একে যেন একটি মধুমক্ষিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফুল থেকে তার নির্যাস গ্রহণ করে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু প্রস্তুত করে, যা বিভিন্ন ফল ও ফুলের নির্যাস হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ একটি নতুন বস্তু হয়ে যায়, যাকে কোনো বিশেষ ফল বা ফুলের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় না।

এ ছাড়া পবিত্র কুরআন শরীফ কেবল পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহ থেকেই তাদের সুদৃঢ় শিক্ষাগুলো গ্রহণ করেনি; বরং যেহেতু এটি একটি চিরস্থায়ী শরিয়তের ধারক, তাই কিয়ামত পর্যন্ত প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বহু নতুন বিষয়ও এতে সংযোজন করে একটি পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন শরিয়ত উপস্থাপন করেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এতে এমন বৈশিষ্ট্যসমূহ ন্যস্ত করা হয়েছে যে, এই দৃশ্যমান জগতের মতো এটিও কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তার উপকরণ নিজের মধ্যে গোপন করে রাখে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকাশিত হতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন শরীফ নিম্নলিখিত শিক্ষাসমূহের সমষ্টি:

প্রথমত, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের সেই অংশসমূহ, যা একটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন শরিয়তের অংশ হতে পারত।

দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন জাতির প্রয়োজনের উপযোগী স্থায়ী শিক্ষা, যা হক্কুল ইবাদ ও হক্কুল্লাহর পূর্ণ আদায় এবং সব ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

যাহোক, এই ধারণা যে পবিত্র কুরআন শরীফ অথবা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত খ্রিস্টধর্ম বা অন্য কোনো ধর্মের শিক্ষার ফল ছিল, সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল। এমন দাবি সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিশেষত, বুহাইরা রাহিব প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাতের দিকে ইসলামী শিক্ষাকে সম্পর্কিত করা তো একেবারেই হাস্যকর কথা, যা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে আসতে পারে না।

মহানবী (সা.)-এর বকরী চরানো

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শাম সফর থেকে ফিরে এলেন, তখনও যথারীতি হযরত আবু তালিবের কাছেই থাকতেন। কিন্তু যেহেতু আরবে সাধারণত শিশুদের গবাদি পশু চরানোর কাজে নিয়োজিত করা হতো, তাই সেই সময়ে হযরত (সা.)-ও কখনো কখনো এই কাজ করতেন এবং বকরী চরাতেন। নবুওয়তের যুগে তিনি বলতেন যে, বকরী চরানোও নবীদের সুন্নত। এবং আমিও বকরী চরিয়েছি।

একবার সফরের সময় হযরত (সা.)-এর সাহাবীগণ জঙ্গলে পিলু ফল সংগ্রহ করে খেতে শুরু করলে তিনি বললেন, "কালো কালো পিলু খুঁজে খাও। কারণ আমি যখন বকরী চরাতাম, তখনকার অভিজ্ঞতা হলো, কালো রঙের পিলু বেশি উত্তম হয়।"

অমঙ্গল থেকে খোদায়ী সুরক্ষা

সেই সময়েরই একটি ঘটনা হলো, এক রাতে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সেই সঙ্গীকে, যে তাঁর সঙ্গে বকরী চরানোর কাজে অংশ নিত, বললেন:

"তুমি আমার বকরীগুলোর দেখাশোনা করো, যাতে আমি কিছুক্ষণের জন্য শহরে গিয়ে লোকদের মজলিস দেখে আসতে পারি।"

সেই দিনগুলোতে প্রচলন ছিল যে, রাতে লোকেরা কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে গল্প করত এবং কবিতা ও গজলের আসরে সময় কাটাত। কখনো কখনো তারা এর মধ্যেই সারা রাত কাটিয়ে দিত। হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও শৈশবের আগ্রহে এই দৃশ্য দেখতে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা খাতামুন নবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অনর্থক কাজে অংশগ্রহণ পছন্দ করেননি। অতএব তিনি এক স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, কিন্তু পথেই তাঁর ঘুম এসে গেল এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমাতে থাকলেন।

আরেকবার তাঁর মনে একই ইচ্ছা জাগল, কিন্তু তখনও অদৃশ্য সাহায্যের হাত তাঁকে বাধা দিল। নবুওয়তের যুগে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, "সারা জীবনে আমি মাত্র দুইবার এ ধরনের কোনো মজলিসে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু দুইবারই আমাকে বাধা দেওয়া হয়েছিল।"

হরব-ই-ফিজার

আরব একটি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রবণ জাতি ছিল এবং যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করাকে তারা গৌরবের বিষয় মনে করত। এ কারণেই কথায় কথায় তলোয়ার বের হয়ে যেত। আর যখন এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, তখন একটি বড় পাত্রে রক্ত ভরে সবাই তার মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে শপথ করত যে, তারা যুদ্ধ করে মরবে, কিন্তু পিছু হটবে না।

বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ছিল, কারণ প্রত্যেক গোত্রই নিজেদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মেলা ইত্যাদি স্থানে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ একত্রিত হতো, সেখানে যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

অতএব যখন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও শৈশবে ছিলেন, তখন উকাজের মেলার সময়-যা মক্কা থেকে পূর্বদিকে তিন দিনের দূরত্বে একটি মনোরম উপত্যকায় বসত-কায়স-ই-আইলান ও বনু কিনানার মধ্যে কিছু উত্তেজনা শুরু হয়।

সেই সময়ে কায়স-ই-আইলানের বিভিন্ন গোত্র মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। দীর্ঘদিন পর্যন্ত উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে তাদের বিরত রেখেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

ইতিহাসে এই যুদ্ধকে হরব-ই-ফিজার বলা হয়, যার অর্থ হলো অন্যায় যুদ্ধ। কারণ এই যুদ্ধ হারাম শরীফের সীমানায় শুরু হয়েছিল, যেখানে আরবদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল।

যাইহোক, এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এত প্রবলভাবে সংঘটিত হয় যে, জাহেলিয়াত যুগের যুদ্ধগুলোর মধ্যে এটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। একদিকে ছিল বনু কিনানা, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল কুরাইশ গোত্র; অন্যদিকে ছিল কায়স-ই-আইলান, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল হাওয়াজিন গোত্র।

এই যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ শেষ যুদ্ধটি ছিল, যা হরব-ই-ফিজারের চতুর্থ যুদ্ধ নামে পরিচিত। এতে উত্তেজনার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কিছু নেতা নিজেদের রশি দিয়ে বেঁধে নিয়েছিলেন, যাতে তারা পালাতে চাইলেও পালাতে না পারেন।

দিনের প্রথম ভাগে কায়স-ই-আইলানের পাল্লা ভারী ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনু কিনানা তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কায়স-ই-আইলানের পরাজয়ের পর উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়।

এই যুদ্ধে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজে যুদ্ধে লিপ্ত হননি; বরং তাঁর অংশগ্রহণ এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল যে, তিনি সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর চাচাদের তীর এগিয়ে দিতেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় বিশ বছর ছিল।

এই যুদ্ধে প্রত্যেক গোত্রের আলাদা আলাদা সেনাপতি ছিল। বনু হাশিম ছিলেন যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিবের অধীনে। কিন্তু বনু কিনানার সমগ্র বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হারব ইবনে উমাইয়া, যিনি আবু সুফিয়ানের পিতা এবং আমীর মুয়াবিয়ার দাদা ছিলেন।

৯ পাতার পর.....

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনওয়ার বলেন:"যে ব্যক্তি নাসির হোক বা খাদেম-যদি সে তার নিজ নিজ খুদ্দাম বা নাসির সংগঠনের চাঁদার বকেয়াদার হয়, তাহলে সে না সংশ্লিষ্ট খুদ্দাম/আনসার সংগঠনের কোনো পদাধিকারী হতে পারে, না জামাআতের কোনো পদাধিকারী হতে পারে।"

চাঁদা প্রদানের বিষয়ে হুযূর আনওয়ার বলেন:

"যেসব আবশ্যিক চাঁদা রয়েছে, সেগুলো প্রতি মাসে আয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করা উচিত। আমাদের চেষ্টা থাকে যে শেষ দিনগুলোতে এসে চাঁদা দিই। যদি প্রতি মাসে আয় হয়ে থাকে, তাহলে প্রতি মাসেই চাঁদা দেওয়া উচিত। কেউ যদি কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম দিতে চায়, তাহলে সে নিয়মিতভাবে লিখিত আবেদন করে মাফ করিয়ে নিতে পারে।"

হুযূর আনওয়ার বলেন: "কোনো কোনো ব্যক্তির আয় চার বা ছয় মাস পরপর আসে। তাঁদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে; তাঁরা সেই সময়ের চাঁদা একসঙ্গে দেবেন। কিন্তু যাদের নিয়মিত আয় রয়েছে, তাদের প্রতি মাসে চাঁদা দেওয়া উচিত।"

হুযূর আনওয়ার বলেন:"ওসিয়তের চাঁদা এমন একটি চাঁদা, যা কমও হয় না এবং মাফও হয় না। এতে কোনো হ্রাস হতে পারে না।"

হুযূর আনওয়ার বলেন:"আপনাদের বোঝানো উচিত যে, চাঁদা কোনো ট্যাক্স নয়। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরিফের সূরা আল-বাকারার শুরুতেই এর উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

'যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যা রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।'(আল-বাকারা: ৪)

অতএব এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তারা নিজেদের ঈমান বৃদ্ধির জন্য, তাকওয়া অর্জনের জন্য এবং আল্লাহ্?র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানি করে। সুতরাং এই আর্থিক কুরবানি কোনো Tax নয়।

এর মধ্যে এটিও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্? তা'আলা মানুষকে যে জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেছেন, সেগুলোকেও তারা দ্বীনের সেবা এবং আল্লাহ্?র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করবে।" (বাকি আগামীতে)

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩)

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

{৮৮} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব সানোরী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ১৮৮৪ সালে হযরত সাহেবের ইচ্ছা হয়েছিল যে, কাদিয়ান থেকে বাইরে গিয়ে কোথাও চিল্লা করবেন এবং ভারতবর্ষও ভ্রমণ করবেন। অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলেন যে, গোর্দাসপুর জেলার সোজনপুরে গিয়ে নির্জনে থাকবেন। এ বিষয়ে হযরত নিজের হাতে লেখা একটি পোস্টকার্ডও আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি আরজ করলাম যে, এই সফর এবং ভারতবর্ষের সফরেও যেন হযরত আমাকে সঙ্গে রাখেন। হযরত তা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু পরে সোজনপুরের সফর সম্পর্কে হযরত ইলহাম পেলেন যে, "তোমার গ্রন্থি হুশিয়ারপুরে খোলা হবে।" অতএব তিনি সোজনপুর যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করে হুশিয়ারপুর যাওয়ার ইচ্ছা করলেন।

যখন ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি হুশিয়ারপুর যাওয়ার জন্য রওনা হলেন, তখন আমাকে চিঠি লিখে হযরত কাদিয়ানে ডেকে নিলেন এবং শেখ মেহর আলী, রঈস হুশিয়ারপুরকে চিঠি লিখলেন যে, আমি দুই মাসের জন্য হুশিয়ারপুর আসতে চাই। এমন কোনো বাড়ির ব্যবস্থা করে দিন, যা শহরের এক প্রান্তে হবে এবং তাতে একটি ওপরের কক্ষও থাকবে। শেখ মেহর আলী তাঁর একটি বাড়ি, যা "তবেলা"নামে পরিচিত ছিল, খালি করিয়ে দিলেন।

হযরত বহলিতে বসে বিয়াস নদীর পথ দিয়ে রওনা হলেন। আমি, শেখ হামিদ আলী এবং ফতেহ খান সঙ্গে ছিলাম। মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব বলতেন যে, ফতেহ খান হুশিয়ারপুর জেলার টান্ডার নিকটবর্তী রসুলপুরের বাসিন্দা ছিল এবং হযরতের বড় ভক্ত ছিল। কিন্তু পরে মাওলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভীর প্রভাবে পড়ে মুরতাদ হয়ে যায়।

হযরত যখন নদীর কাছে পৌঁছালেন, তখন নৌকা পর্যন্ত পৌঁছানোর পথে কিছু পানি ছিল। তাই মাঝি হযরতকে তুলে নৌকায় বসিয়ে দিল। এতে হযরত তাকে এক টাকা পুরস্কার দিলেন। নদীতে যখন নৌকা চলছিল, তখন হযরত আমার দিকে মুখ করে বললেন, "মিঞা আবদুল্লাহ! কামেলের সঙ্গ এই নদী-সফরের মতো, যাতে পার হওয়ারও আশা আছে এবং ডুবে যাওয়ারও আশঙ্কা আছে।" আমি হযরতের এই কথা সাধারণভাবেই শুনেছিলাম। কিন্তু যখন ফতেহ খান মুরতাদ হয়ে গেল, তখন আমার হযরতের সেই কথা মনে পড়ল।

যাইহোক, আমরা পথে ফতেহ খানের গ্রামে অবস্থান করে পরদিন হুশিয়ারপুর পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছেই হযরত তবেলার ওপরের কক্ষে অবস্থান করলেন। আমাদের মধ্যে যেন কোনো ঝগড়া না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের তিনজনের আলাদা আলাদা কাজ নির্ধারণ করে দিলেন। আমার দায়িত্ব হলো রান্না করা। ফতেহ খানের দায়িত্ব দেওয়া হলো বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইত্যাদি নিয়ে আসা। শেখ হামিদ আলীর কাজ নির্ধারিত হলো বাড়ির বাইরের কাজকর্ম করা এবং আগত লোকদের আতিথেয়তা করা।

এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হাতে লেখা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোনো সাহেব যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না আসেন এবং কেউ যেন আমাকে দাওয়াতেও না ডাকেন। এই চল্লিশ দিন শেষ হওয়ার পর আমি আরও কুড়ি দিন এখানে থাকব। এই বিশ দিনে যারা সাক্ষাৎ করতে চান তারা সাক্ষাৎ করতে পারবেন, যারা দাওয়াতের ইচ্ছা রাখেন তারা দাওয়াত করতে পারবেন এবং যারা প্রশ্নোত্তর করতে চান তারা প্রশ্নোত্তর করতে পারবেন।

হযরত আমাদেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রবেশদ্বারের ভেতরের শিকল সবসময় লাগানো থাকবে এবং ঘরের মধ্যেও কেউ যেন আমাকে ডাকতে না আসে। আমি যদি কাউকে ডাকি, তবে সে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমার কথার উত্তর দেবে, এর বেশি নয়। ওপরের কক্ষে কেউ আমার কাছে আসবে না। আমার খাবার ওপরের কক্ষে পৌঁছে দেওয়া হবে, কিন্তু আমি খাবার শেষ করব-এমন অপেক্ষা করা হবে না। খালি পাত্র পরবর্তী সময়ে নিয়ে যাবে।

নামাজ আমি ওপরেই আলাদাভাবে পড়ব, তোমরা নিচে পড়বে। জুমার ব্যাপারে হযরত বললেন, এমন একটি নির্জন মসজিদ খুঁজে বের করো, যা শহরের এক পাশে হবে, যেখানে আমরা আলাদাভাবে নামাজ আদায় করতে পারি। অতএব শহরের বাইরে একটি বাগানে একটি ছোট ও নির্জন মসজিদ ছিল। সেখানে শুক্রবারের দিন হযরত যেতেন এবং আমাদের নামাজ পড়াতেন এবং নিজেই খুতবাও পাঠ করতেন।

মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করতেন যে, আমি খাবার রেখে আসার জন্য ওপরের কক্ষে যেতাম এবং হযরতের সঙ্গে কোনো কথা বলতাম না। তবে কখনো হযরত নিজে আমার সঙ্গে কোনো কথা বললে আমি উত্তর দিতাম। একবার হযরত আমাকে বললেন, "মিঞা আবদুল্লাহ! এই দিনগুলোতে আমার ওপর আল্লাহ তাআলার বড় বড় অনুগ্রহের দরজা খুলে গেছে এবং কখনো কখনো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমার সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। এগুলো যদি লিখে রাখা হয়, তাহলে কয়েকটি পৃষ্ঠা হয়ে যাবে।"

মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব বলেন যে, প্রতিশ্রুত পুত্রের ব্যাপারে ইলহামগুলোও এই চিল্লার সময়েই হয়েছিল এবং চিল্লার পর হুশিয়ারপুর থেকেই হযরত এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিলেন।

(খাকসার আরজ করে যে, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ সালের বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য।)

চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে হযরত ঘোষণা অনুযায়ী আরও বিশ দিন সেখানে অবস্থান করলেন। এই দিনগুলোতে অনেক লোক দাওয়াত করেছিল এবং অনেক লোক ধর্মীয় মতবিনিময়ের জন্য এসেছিল। বাইরে থেকেও হযরতের পুরনো পরিচিত লোকেরা অতিথি হয়ে এসেছিলেন। এই দিনগুলোর মধ্যেই মুরলীধরের সঙ্গে হযরতের বিতর্ক হয়েছিল, যা "সুরমা চশমা আরিয়া-তে লিপিবদ্ধ আছে।

যখন দুই মাসের সময় পূর্ণ হলো, তখন হযরত একই পথ দিয়ে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। হুশিয়ারপুর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে এক বুযুর্গের কবর ছিল, যার চারপাশে একটি ছোট বাগানও ছিল। সেখানে পৌঁছে হযরত কিছুক্ষণের জন্য বহলি থেকে নেমে বললেন, "এটি সুন্দর ছায়াময় জায়গা। এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করি।"

এরপর হযরত কবরের দিকে গেলেন। আমিও পেছন পেছন সঙ্গে গেলাম এবং শেখ হামিদ আলী ও ফতেহ খান বহলির কাছে রয়ে গেল। হযরত মকবরায় পৌঁছে তার দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং কবরের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং কিছুক্ষণ দোয়া করলেন। তারপর ফিরে এসে আমার দিকে মুখ করে বললেন:

"আমি যখন দোয়ার জন্য হাত তুললাম, তখন যে বুযুর্গের এই কবর, তিনি কবর থেকে বের হয়ে এসে আমার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। আপনি সঙ্গে না থাকলে আমি তাঁর সঙ্গে কথাও বলতাম। তাঁর চোখ বড় বড় এবং গায়ের রং শ্যামলা।"

এরপর বললেন, "দেখো, এখানে যদি কোনো মাজারের খাদেম থাকে, তাহলে তাঁর অবস্থা তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করো।"

অতএব হযরত খাদেমের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, "আমি তাঁকে নিজে দেখিনি, কারণ তাঁর ইন্তেকালের প্রায় একশ বছর হয়ে গেছে। তবে আমার বাবা অথবা দাদার কাছে শুনেছি যে, তিনি এই এলাকার একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন এবং এই এলাকায় তাঁর অনেক প্রভাব ছিল।"

হযরত জিজ্ঞেস করলেন, "তাঁর চেহারার বর্ণনা কেমন ছিল?য

সে বলল, "শুনেছি, গায়ের রং শ্যামলা ছিল এবং চোখ বড় বড় ছিল।"

তারপর আমরা সেখান থেকে রওনা হয়ে কাদিয়ানে পৌঁছলাম।

খাকসার মিঞা আবদুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, হযরত এই নির্জনবাসের সময়ে কী করতেন এবং কীভাবে ইবাদত করতেন? মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব উত্তর দিলেন, "এটি আমাদের জানা নেই, কারণ তিনি ওপরের কক্ষে থাকতেন এবং আমাদের ওপর সেখানে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা ছিল। খাবার ইত্যাদির জন্য যখন আমরা ওপরের কক্ষে যেতাম, তখন অনুমতি নিয়ে যেতাম।"

মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করতেন যে, একদিন আমি খাবার রাখার জন্য ওপরের কক্ষে গেলে হযরত বললেন, "আমি ইলহাম পেয়েছি:

بُورِکَ مَنْ فِيهَا وَمَنْ حَوْلَهَا এবং হযরত এর ব্যাখ্যা করলেন যে, 'মান ফিহা"দ্বারা আমি উদ্দেশ্য এবং 'মান হাওলাহা' দ্বারা তোমরা উদ্দেশ্য।"

মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করতেন যে, আমি সারা দিন ঘরের মধ্যেই থাকতাম। শুধু শুক্রবার হযরতের সঙ্গে বাইরে যেতাম। শেখ হামিদ আলীও অধিকাংশ সময় ঘরেই থাকতেন। কিন্তু ফতেহ খান প্রায় সারা দিনই বাইরে থাকত। খাকসার আরজ করে যে, সম্ভবত এই ইলহামের সময়ও সে বাইরে ছিল।

মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করতেন যে, সেই সময় ফতেহ খান এত বেশি ভক্ত ছিল যে, আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় বলত, "আমি তো হযরত সাহেবকে নবী মনে করি।" আর আমি তার এই কথায় প্রচলিত পুরনো আকীদার কারণে আতঙ্কিত হতাম।

মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব আরও বর্ণনা করেন যে, একবার আমি খাবার দিতে গেলে হযরত বললেন, "আল্লাহ আমার সঙ্গে এভাবে সম্বোধন করেন এবং আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যে, যদি আমি সেগুলোর সামান্য কিছু প্রকাশও করি, তাহলে যারা এত ভক্ত বলে মনে হচ্ছে, তারা সবাই ফিরে যাবে।"

{৮৯} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব সানোরী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বাইতুল ফিকরে (মসজিদে মুবারকের পাশের সেই কক্ষ, যা হযরত সাহেবের বাড়ির অংশ) শুয়ে ছিলেন এবং আমি তাঁর পা টিপছিলাম। এমন সময় কক্ষের জানালায় লালা শর্মপত অথবা সম্ভবত লালা মুলাওয়ামল কড়া নাড়লেন।

আমি উঠে জানালা খুলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হযরত অত্যন্ত দ্রুত উঠে আমার আগেই গিয়ে শিকল খুলে দিলেন। তারপর নিজের জায়গায় এসে বসে বললেন, "আপনি আমাদের অতিথি, আর হযরত আকরাম (সা.) বলেছেন যে, অতিথির সম্মান করা উচিত।"

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 3 Sep 2026 Issue No.36

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

৭ পাতার পর.....
হয়ে আরজ করত, 'মির্জা জি! কাকি অসুস্থ হয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরছে না, খুব বেশি জ্বর উঠেছে।' তারপর হাতের দিকে ইশারা করে বলত, 'দেখুন! আমরা হাতও ধুয়ে আসিনি।'

একবারের ঘটনা হলো, একজন মহিলা যার হাত গোবরে ভরা ছিল, নিজের কাজ করছিল, সে হুজুর (আঃ)-এর কাছে এসে আরজ করল, 'আমার মেয়ে অসুস্থ। খুব বেশি জ্বর। একেবারে অচেতন।'

হুজুর (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কোনো পাত্র এনেছ?'

সে গোবরমাখা হাত দিয়ে একটি মাটির পেয়ালা হুজুর (আঃ)-এর সামনে পেশ করল। হুজুর (আঃ) পেয়ালাটি নিয়ে তাতে রূহ কেওড়া ভরে দিলেন এবং প্রায় পাঁচ রতি পরিমাণ কস্তুরি দিয়ে বললেন, 'দুইবার অর্ধেক পেয়ালা করে এই ওষুধ খাওয়াবে।' এছাড়াও বললেন, 'আমাকে জানাবে যে মেয়েটির কী অবস্থা হয়েছে।'

(সূত্র: রেওয়ায়াতে আসহাবে আহমদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৪৯, হযরত বাবু গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রাঃ)-এর বর্ণনা)

গরিবদের প্রতিও তাঁর অত্যন্ত উত্তম আচরণ ও অনুগ্রহ ছিল।

শেখ মুহাম্মদ নসীব সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন:

"একবার আমার প্রয়োজন দেখা দিলে আমি হযরত (আঃ)-এর খেদমতে লিখলাম যে, দশ টাকা ঋণ হিসেবে পাঠিয়ে দিন। আমি দুই কিস্তিতে তা ফেরত দেব। তিনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন।"

(রেওয়ায়াতে আসহাবে আহমদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৪৬, হযরত শেখ মুহাম্মদ নসীব সাহেব (রাঃ)-এর বর্ণনা)

আর এটি তো সর্বদাই তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কখনো কাউকে প্রত্যাখ্যান করতেন না। আমরা এটিও দেখেছি যে, তিনি ঋণ ফেরত দেওয়ার জন্য তাগাদাও করতেন না। বরং কেউ যদি ফেরত দিতে চাইত, তখন তিনি বলতেন, "না, আমাদের সম্পদ তোমার সম্পদ-দুটো একই। তুমি নিজের কাছেই রেখে দাও।"

এটিই ছিল তাঁর অভ্যাস।

(সূত্র: সীরাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব আরফানি (রাঃ), অংশ ৩, পৃষ্ঠা ৩০৭)

খাবারে বরকতেরও একটি ঘটনা পাওয়া যায়।

হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) লিখেছেন যে, মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব সানোরি (রাঃ) বলেন:

"একবার হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কয়েকজন মেহমানকে দাওয়াত করলেন এবং তাঁদের জন্য বাড়িতে খাবার প্রস্তুত করালেন। কিন্তু ঠিক যখন খাওয়ার সময় হলো, তখন একই সংখ্যক আরও কয়েকজন মেহমান এসে গেলেন এবং মসজিদে মুবারক মেহমানদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। মসজিদটি ছোট ছিল।

হযরত সাহেব (আঃ) ভেতরে খবর পাঠালেন যে, 'আরও মেহমান এসেছেন, খাবার বেশি পাঠাও।'

এটি তো হতে পারত না যে, তাঁর দস্তরখানে কেউ আসবে, কিছু লোক খাবে আর বাকিদের তিনি খাবার দেবেন না। এটি তাঁর স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। এটি তাঁর দানশীলতারও পরিপন্থী ছিল। তিনি তো যে কোনোভাবে সবাইকে খাবার খাওয়াতেই চেয়েছিলেন।

এ সময় হযরত বিবি সাহেবা, হযরত আম্মাজান (রাঃ), হযরত সাহেব (আঃ)-কে ভেতরে ডাকলেন এবং বললেন, 'খাবার তো অল্প পরিমাণে আছে। কেবল সেই কয়েকজন মেহমানের জন্য রান্না করা হয়েছে, যাদের জন্য আপনি আগে বলেছিলেন। হয়তো বাকি খাবার কিছুটা টানাটানি করে ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে, কিন্তু জর্দা তো খুবই অল্প। এর কী করা যাবে?'

তখন হযরত আম্মাজান (রাঃ) নিজেই বললেন, 'জর্দা পাঠাব না। বাকি খাবার বের করে দিচ্ছি।'

হযরত সাহেব (আঃ) বললেন, 'না! এটি উপযুক্ত হবে না। তুমি জর্দার পাত্রটি আমার কাছে নিয়ে এসো।'

অতঃপর হযরত (আঃ) সেই পাত্রের ওপর একটি রুমাল দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর রুমালের নিচ দিয়ে নিজের হাত প্রবেশ করিয়ে তাঁর আঙুলগুলো জর্দার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'এখন তোমরা সবার জন্য খাবার বের করো। আল্লাহ বরকত দেবেন।'

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব (রাঃ) বলেন, জর্দা সবার জন্য পরিবেশন করা হলো। সবাই খেল এবং তারপরও কিছু জর্দা অবশিষ্ট রয়ে গেল।

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন যে, বাড়ির এই ঘটনাটি স্বয়ং হযরত সাহেব (আঃ) তাঁকে বলেছিলেন যে, যখন বাড়ির ভেতর থেকে এই কথা জানানো হয়েছিল, তখন তিনি এভাবে বলেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাতে বরকত দিয়েছিলেন।"

(সূত্র: সীরাতুল মাহদী, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৫, বর্ণনা ১৪৪)

তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে বন্ধুদের মৌসুমি ফল ইত্যাদিও খেতে দিতেন। পরিবেশন করতেন। এতে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছিল না; সর্বদাই ছিল তাঁর পক্ষ থেকে দান ও অনুগ্রহ।

হযরত মুমতাজ আলী সাহেব সিদ্দিকী (রাঃ) বলেন:

"আমার মনে আছে, বাগানে একটি শাহনশীন ছিল, যা আবারও মেরামত করা হয়েছে। সেখানে হুজুর (আঃ) তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এসে বসতেন এবং কখনো কখনো সেখানে বসে মৌসুমি ফলও খেতেন। একবারের কথা আমারও মনে আছে যে, হুজুর (আঃ) নিজ হাতে আমাকে দুটি আম দান করেছিলেন এবং একইভাবে অন্যান্য বন্ধুদেরও দুটি করে আম দিয়েছিলেন।"

(রেওয়ায়াতে আসহাবে আহমদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৪, হযরত মুমতাজ আলী সিদ্দিকী সাহেব (রাঃ)-এর বর্ণনা)

এগুলো হলো হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দানশীলতা ও অনুগ্রহের কয়েকটি ঘটনা, যার আদর্শ তিনি তাঁর প্রভু ও নেতা হযরত আকদাস রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে প্রদর্শন করেছেন। তাঁর এই অনুগ্রহ ও দানশীলতা থেকে আপন-পর, এমনকি তাঁর শত্রুরাও উপকৃত হয়েছে।

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

দুইশতবার দরুদ শরীফ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

(Holy is Allah and worthy of all praise. Holy is Allah,the Great. O Allah! bestow Your blessings on Muhammadsa and on the people of Muhammad sa.)

একশতবার 'আসতাগফিরুল্লাহ্'

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

নিম্নোক্ত দোয়াটি একশতবার

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

(O my Lord! Everything serves You. So, O my Lord, protect me and help me and have mercy on me.)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir